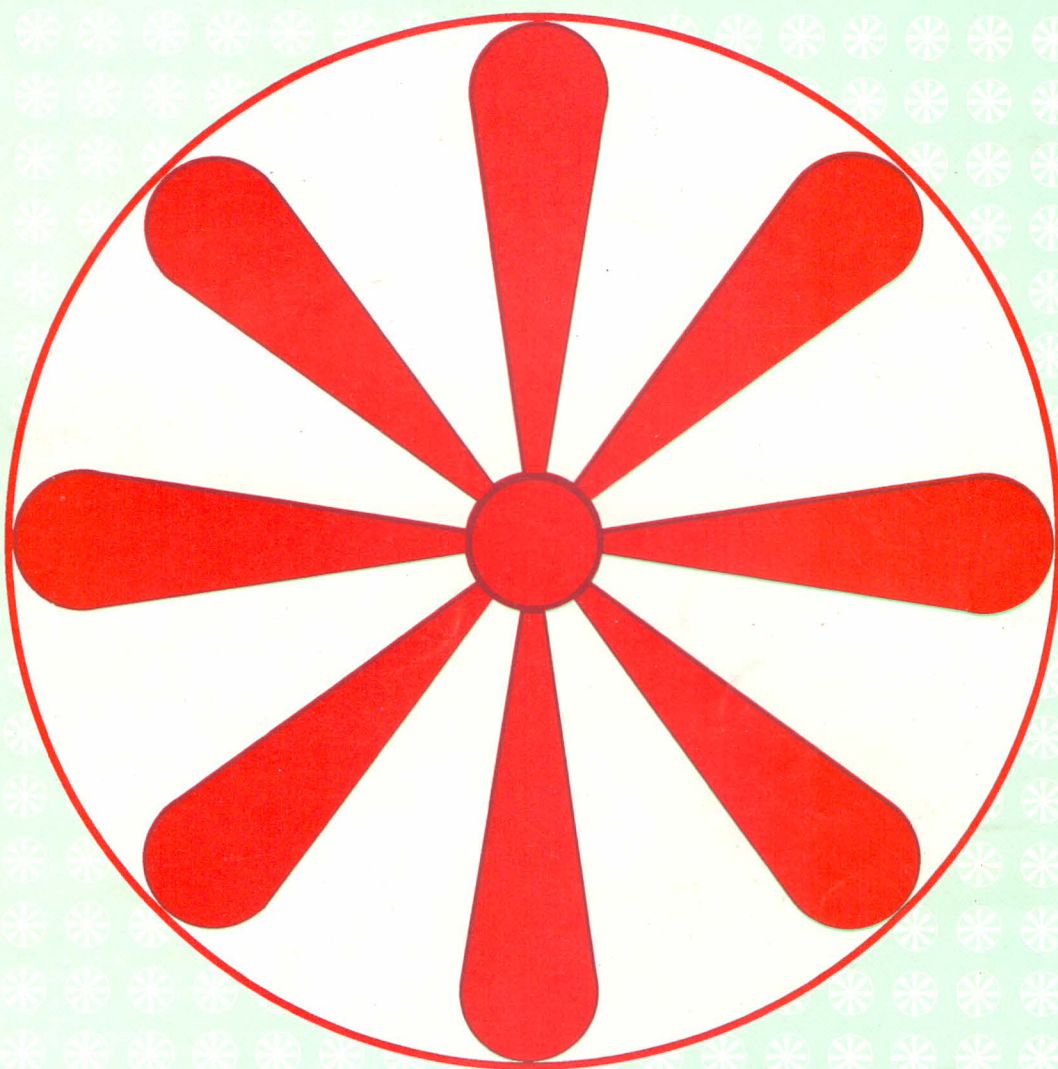


একবিংশতিতম কঠিন চীবরদান

স্মরণিকা '৯৪



রাজবন বিহার

রাজবন, রাঙ্গামাটি।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

একবিংশতিতম কঠিন চীবরদান স্মরণিকা '৯৪

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ



ঃ স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ ঃ

- | | |
|------------------------|--------------------|
| □ সুনীতি বিকাশ চাক্মা | - আহবায়ক |
| □ নির্মল কান্তি চাক্মা | - প্রকাশনা সম্পাদক |
| □ শান্তিময় চাক্মা | - সদস্য |
| □ বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা | - সদস্য |
| □ সজ্জিত কুমার চাক্মা | - সদস্য |

একবিংশতিতম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা '৯৪

প্রকাশনায় :

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন বিহার, রাজবন, রাজ্জামাটি,
রাজ্জামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশকাল :

১১ই নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং

২৭শে কার্তিক, ১৪০১ বাং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় :

নির্মল কান্তি চাক্মা

কম্পিউটার কম্পোজ ও

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে :

বিন্যাস

৪২ শৈল বিতান, রাজ্জামাটি।

মুদ্রণ :

নিও কনসেপ্ট লিঃ, চট্টগ্রাম।

ওভেরস্টা মূল্য :

হিতোপদেশ

মানুষ সৎপুরুষ আৰ্য্যগণের-দর্শন, তাঁহাদের সঙ্গে একস্থানে অবস্থান এবং তাঁহাদের সেবাপ্রশ্রমায় সুখী হয় এবং নির্ব্বোধগণের সঙ্গে ত্যাগেও পরম সুখ উপপন্ন হয়। কেননা, যাহারা অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য্যে থাকে, তাহারা তাহাদের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া কুপথে বিচরণ করিতে থাকে এবং দীর্ঘকাল শোকানুতাপ ভোগ করে। সেইজন্য শত্রুর সঙ্গে বাস করা দুঃখ ও নিত্য বিপজ্জনক। যাহারা অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে ত্যাগ করিয়া পণ্ডিত সাহচর্য্যে বাস করেন তাঁহাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠে এবং তাহা জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বাস তুল্য সুখময় হয়। সেইজন্য অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ধৃতিসম্পন্ন, লৌকিক লোকোত্তর জ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রবিদ, বহুদর্শী, অহংধূরে অবস্থিত, ধৈর্য্যশীল, শীলাচারসম্পন্ন, পাপ তৃষ্ণা হইতে দূরে অবস্থানকারী আৰ্য্য ও সুমেধাসম্পন্ন সৎপুরুষের নীতি অনুসরণ কর।

সার্বভৌম মহাপ্রভু-
৯৫-২০-২৪ ২২

**ENGLISH TRANSLATION OF HIS HOLINESS
REV. SADHANANANDA MAHATHERA'S (REV. VANAVHANTE)
ADVICE TO LAY DEVOTEES.**

Man achieves happiness at the sight of the noble ones, by living together in close contact with them and rendering services to them. Happiness also springs up by forsaking the company of the ignorant. Because, those who live in close contact with the ignorant they wander in the wrong path being misguided by them and suffer from sorrow and lamentation for a long period. For this reason it is always dangerous and sorrowful to live with an enemy. Those who live with the wise by forsaking the ignorant, their lives become pleasant which is compared to peaceful living with the close relatives. Therefore, forsake the company of the ignorant totally and follow the path of the wise, conversant, well-versed, patient, noble, highly intelligent, trained in morality on the way of holiness, those who possess the mundane and super mundane knowledge and keep away from evils and cravings.

Dated:- 15.10.94.

সর্ধনানন্দ মহাশয়
১৫ - ১০ - ১৪

মহান আৰ্য পুৰুষ পৰম শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীমৎ সাধনানন্দ মহাহুবিৰ (বনভণ্ডে)

মহোদয় ও অনুত্তৰ পুণ্যক্ষেত্ৰ ভিক্ষু সংঘেৰ সমীপে

দানোত্তম কঠিন চীবৰ দান/৯৪

উপলক্ষে

ঃ বিশেষ প্ৰাৰ্থনা ঃ

শ্ৰদ্ধেয় ভণ্ডে সংঘো,

দেব-মনুষ্য তথা সকল প্ৰাণীৰ হিতসুখ ও মঙ্গলৰ জন্য, আমাদেৰ চাৰিআৰ্য সত্য জ্ঞান উদয় ও স্থিতিৰ জন্য, সধৰ্মেৰ শাসন উত্তরোত্তৰ শ্ৰীবৃদ্ধি ও স্থিতিৰ জন্য, দেবৰাজ ইন্দ্ৰ, চাৰিদিক পাল মহাৰাজ, যক্ষৰাজ, যমৰাজ এবং বুদ্ধেৰ ধাৰ্মিক ও ধনী উপাসক দেবতাবৃন্দ আমাদেৰ প্ৰতি সৰ্বকালে সকল বিষয়ে সহায় হওয়াৰ জন্য এবং বৃহত্তৰ পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম তথা সাৰা বিশ্বে লুপ্ত প্ৰায় সধৰ্ম পুনঃ প্ৰজ্জ্বলিত, শ্ৰীবৃদ্ধি ও স্থিতিৰ জন্য মহান আৰ্য পুৰুষ শ্ৰীমৎ সাধনানন্দ মহাহুবিৰ (বনভণ্ডে) ও বুদ্ধেৰ চাৰি পৰিষদ সমীপে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰছি।

শ্ৰদ্ধেয় ভণ্ডে সংঘো,

আমরা আপনাৰ জ্ঞান, সত্য ও সকল মহাশক্তিৰ প্ৰভাবে হাৰানো সধৰ্ম, শিষ্টাচাৰ, বিনম্ৰভাব, পৰম্পৰ মৈত্ৰী বন্ধন, ভূ-সম্পত্তিসহ সকল স্থাবৰ-অস্থাবৰ বিষয় সম্পত্তি, সংখ্যা গৰিষ্ঠতা, আজ্ঞাচক্ৰ, সকল বিষয়ে মাণিকানা, অধিকাৰ, ক্ষমতা, আদৰ্শ বৌদ্ধ সমাজ অচিৰেই পুনঃ লাভ ও স্থিতি হওয়াৰ জন্য আপনাৰ সমীপে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰছি।

শ্ৰদ্ধেয় ভণ্ডে সংঘো,

আপনি আমাদেৰকে জ্ঞান দান কৰুন যাতে আমরা সেই জ্ঞানেৰ প্ৰভাবে সদা সত্য পথে পৰিচালিত হয়ে সৰ্বকালে, সৰ্বত্ৰই, সকল কাজে জয়ী হতে পাৰি। আপনি আমাদেৰকে ধৰ্মদান কৰুন যাতে আমরা সকল কুশল-অকুশল জ্ঞাত হয়ে কুশল ধৰ্মকেই সংৰক্ষণ কৰতে পাৰি।

আপনি আমাদেরকে অভয় দান করুন যাতে আমরা সর্বকালে সর্বত্রই ভয়হীনভাবে সধর্মাচরণ ও সকল বৈষয়িক কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন পূর্বক সকল বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করতে পারি, তজ্জন্য আপনার নিকটে বিশেষ প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় ভণ্ডে সংঘো,

আমাদের তথা সারা বিশ্ববাসীর সুখ-সমৃদ্ধি, গৌরব সম্মান, বহু সংশ্লিষ্ট, মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি, আর্থধন, সকল ধর্মে সুশিক্ষা, বুদ্ধের সুশীতল ছায়া, সধর্মের শাসন, প্রতিরূপদেশ, ধনধান্যে পরিপূর্ণতা, যথাকালে বারিবর্ষণ, প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ ও ধার্মিক রাজা লাভ ও স্থিতি হওয়ার জন্য আপনার সমীপে বিশেষ প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘো,

অত্র বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা বিশ্ব হতে দণ্ড-ভয়, অস্ত্র-ভয়, চোর-ভয়, অধর্মের শাসন, জাতিগত সংঘাত, বৈষম্য মূলক দুঃশাসন, সকল ষড়যন্ত্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যাভাব, মহামারী, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম, মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিবেশী, অধার্মিক রাজা, অকল্যাণ মিত্র, ষড়যন্ত্রকারী, অন্যায় অমঙ্গল সৃষ্টিকারী, পর সম্পদ হরণকারী, সধর্মের বাধা সৃষ্টিকারী, সধর্মের অপ-প্রচারকারী, আর্থিক উন্নয়নে অন্তরায়কারী, সকল দুঃখ, রোগ, ভয়, অন্তরায়, উপদ্রব এবং দুর্গিমিত্তাং পাপগ্রহ অচিরেই চিরতরে বিনাশ হওয়ার জন্য আপনার সমীপে বিশেষ প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় ভণ্ডে সংঘো,

অনুকম্পা পূর্বক আমাদের প্রার্থনাগুলো অনুমোদন করুন।

দ্বিতীয়বার -----ঐ

তৃতীয়বার-----ঐ

ইতি

ধর্মপ্রাণ

সমবেত নর-নারীবৃন্দ,

রাজ্যমাটি রাজবন বিহার, রাজবন,

রাজ্যমাটি।

তাং ১১/১১/৯৪ইং

রাজ্যমাটি।

সম্পাদকীয়

দুৰ্গভ মানব জীবনের স্বল্প সময়ে যথাযথভাবে সুকৰ্ম সম্পাদন করে যাওয়া অতিশয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আমরা প্রতিবছর প্রবারণার পরের দিন হতে কার্তিক পূৰ্ণিমার মধ্যকার সময়ে কঠিন চীৱর দান কাৰ্য সম্পাদন করে থাকি।

রাক্ষামাটি রাজবন বিহাৱে এবাৱও একবিংশতিতম কঠিন চীৱর দান উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ পূণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতি বছর যে স্বৱণিকা প্রকাশ করা হয় এ বছরও কঠিন চীৱর দান স্বৱণিকা/৯৪ প্রকাশ করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ স্বৱণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা ও প্রকাশনা পৱিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পৱিষদে অন্তৰ্ভুক্ত আছেন সৰ্বজনাব শান্তিময় চাকমা, সুনীতি বিকাশ চাকমা, বীৱ কুমাৱ তঞ্চঙ্গ্যা, সজ্জিত কুমাৱ চাকমা এবং নিৰ্মল কান্তি চাকমা।

স্বৱণিকা প্রকাশের জন্য যে সকল উৎসাহী লেখকদের নিকট হতে প্রবন্ধ, কবিতা পাওয়া গেছে তন্মধ্যে অনেকের লেখা ব্যক্তিগত মত ভিত্তিক, অনুমানভিত্তিক হওয়ায় কিংবা বৌদ্ধ দৰ্শনের পৰ্যায় ক্রমিক সুসামঞ্জস্যতার অভাব হেতু অনেক লেখকের প্রবন্ধ ~~সম্পাদনা~~ সত্ত্বেও ছাপানো সম্ভব হয়নি। আবার লেখকের সম্মতি অনুযায়ী অনেক প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় পৱিবৰ্তন, পৱিবৰ্ধন, সংযোজন এবং সংশোধন করে সুধী জনের নিকট বুদ্ধবাণী প্রচাৱের চেষ্টা করেছে।

আমাদের সম্পাদনার কাজে কিংবা মুদ্রণে যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি পৱিলক্ষিত হয় তজ্জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তা ছাড়া একই বিষয়ে যে সমস্ত লেখা পাওয়া গিয়েছে সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলকভাবে ভাল লেখাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে এ বছর হঠাৎ কাগজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য বছরের মত স্বৱণিকার কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। বৰ্তমান স্বৱণিকায় রাজবন বিহাৱের বিভিন্ন জায়গাৱ শাখা বিহাৱগুলোৱ বিবৱণ দেয়াৱ কথা থাকলেও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করেও অনেক শাখা বিহাৱের তথ্য আমাদের কাছে না পৌছায় সে গুলোৱ বিবৱণ দেয়া সম্ভব হলো না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এ স্বৱণিকা পাঠে কোন ধৰ্মপ্রাণ নৱনারী যদি যৎ কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তাহলে আমাদের শ্রম সাৰ্থক বলে মনে কৱবো।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক,
দুঃখ থেকে মুক্ত হোক।

ইতি
নিৰ্মল কান্তি চাকমা
সম্পাদক

কঠিন চীৱর দানোৎসব স্বৱণিকা '৯৪
রাজবন বিহাৱ, রাজবন, রাক্ষামাটি।

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

পবিত্র পুণ্যতীর্থ রাজবন বিহারে একবিংশতিতম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান উপলক্ষে এ' স্মরণিকা প্রকাশ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অত্র বিহারের এ' দানানুষ্ঠান এদেশের বৌদ্ধ সমাজের একটি সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব। এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এ'ধর্মোৎসবের প্রভাব অপরিসীম। এ'তে অংশগ্রহণের আগ্রহ বা ইচ্ছায় মনে সাড়া জাগে না আজকের বৌদ্ধ সমাজে এমন লোক খুবই কম বলা যায়। প্রতি বছর রাজবন বিহারে এ'ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনে সর্বস্তরের বৌদ্ধ জনসাধারণ কায়িক-বাচনিক-আর্থিক ও অন্য নানাভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দানে যেভাবে এগিয়ে আসেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করলে উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজে প্রমাণিত হয়।

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের একটি মহা পুণ্যপ্রসূ দানক্রিয়া। বস্তু দানের মধ্যে কঠিন চীবর দানই সর্বাপেক্ষা পুণ্যজনক কাজ। তাই জীবনে অন্ততঃ একবার হলেও এ' মহা ফলদায়ক দানানুষ্ঠানে শরীক হয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে প্রত্যেকের মনে প্রবল সাড়া জাগে। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের সন্দর্শন ও কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য এদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে অগণিত পুণ্যাখী গভীর শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে এ' পবিত্র রাজবন তীর্থে আগমন করেন। এ' মহতী পুণ্যানুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন এ' পুণ্যযজ্ঞে যোগদান করতে পারার আনন্দের আবেগে মানুষ নিজকে খুলে দেয়, মেলে দেয়- মিলতে চায় অপরের সঙ্গে। মানুষে মানুষে মিলনের আনন্দে সমগ্র অনুষ্ঠানের বহিরাঙ্গটি উৎসব মুখর রূপ নেয়। ইহা এতদঞ্চলের বৌদ্ধগণের প্রবল ধর্মানুরাগ, সৎকর্মের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ এবং কুশল চেতনার বহিঃপ্রকাশ না বলে পারা যায় না। যে ধর্মীয় ভাবের অনুপ্রেরণা নিয়ে এ' দানযজ্ঞ সম্পাদনের মত দুর্লভ কাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তা' আর্য্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মহান প্রভাব ও অক্লান্তভাবে তাঁর ধর্মোপদেশ দানের

ফলশ্রুতিতে নর নারীগণের মধ্যে যে ধর্মীয় উন্মেষ ঘটেছে তার বাস্তব প্রতিফলন বলা যায়। যা হোক এ'ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও অনুষ্ঠান সম্পাদনের মধ্য দিয়ে যদি বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং ব্যক্তিগত তথা সমাজ জীবনে প্রভূত হিত সাধন হয় সেটাই হবে আমাদের পরম পাওয়া ও অনুষ্ঠান সম্পাদনের সার্থকতা। সেবিষয়ে প্রত্যেকের উত্তরোত্তর সচেতনতা বৃদ্ধি হোক এবং যাতে সুস্থ-সুন্দর বৌদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারি তাহাই হোক আমাদের আজকের মহান অঙ্গীকার।

অত্র প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, দৈনন্দিন চতুর্প্রত্যয়ের সুব্যবস্থা, আবাসিক ভিক্ষুসংঘের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে মহোদয়ের ধর্মপ্রচারের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ইহার সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে আসার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সবার।

“সকল প্রাণী সুখী হোক।”

সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক)

সভাপতি

১১ই নভেম্বর '৯৪ ইং

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

শুক্রবার।

রাজবন, রাজমাটি।

প্রতিবেদন

নিত্যদিনকার মত সেদিনও লাইনের বাসে চড়ে কলেজে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কে যেন বল্লো- “মানুষের দুঃখ মানুষে নবুঝিলে ঈশ্বা কন্দোল্যা মানুষ।” কথাটা কানে আসতেই মনের অগোচরে ভাবতে লাগলাম। আসলে কি তাই। আজকাল মানুষ কি মানুষের দুঃখ বুঝতে চায় না। এতই কি স্বার্থপর। মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, মৈত্রী, মমত্ববোধ যেন হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। তাহলেতো বলতে হয় মানুষ পশুর স্থান দখল করে নিচ্ছে। কারণ কোন পশুর পক্ষে মানুষের দুঃখ বুঝার সুযোগ কোথায়। পশু হলো অপায় প্রাণী। যার কোন উপায় নেই। অর্থাৎ ভালমন্দ, হিত-অহিত, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বুঝবার শক্তি যাদের নেই। কিন্তু মানুষতো প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। মানুষের মগজ স্নায়ু বিন্যাস এতই নিখুঁত এবং সূক্ষ্মতর যে, এটিকে মানবের কল্যানমুখী চিন্তা চেতনায় উন্মোচ ঘটিয়ে ভাল কিছু করার যেমনি সুযোগ আছে ঠিক তেমনি মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধ্বংস যজ্ঞের কালিমা ঐকে দিতেও এর কোন কমতি নেই। নাগাসাকি, হিরোশিমা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। মানুষের দুঃখ বুঝতে হলে তার যে কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে আজকাল সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকালে সেতো কল্পনাই করা যায় না। তবে এটাও ঠিক যে, মানবের চরম বিপর্যয়কালে যুগে যুগে মানব মুক্তির জন্য মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঠিক যেমনি আবির্ভাব ঘটেছিল তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের। তিনি মানবের- জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, দুঃখের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত দেখে এ’সব দুঃখের মুক্তির পথ আখ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণপথ দেখিয়েছেন। তিনিও ছিলেন আমাদেরই মতো রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তিনি নিজে যেমন মুক্ত হয়েছেন অন্যকেও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

আজ আমাদের সমাজ জীবনের চরম বিপর্যয় মুহর্তে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্ত) মহোদয়ের আবির্ভাব যে কতটুকু প্রয়োজন আজ তার সঠিক মূল্যায়নের সময় এসেছে। তিনি সকল প্রাণীর মঙ্গল করার অঙ্গিকার করেছেন। অর্থাৎ যে সমাজের ইতিহাসে অকুশল কর্মের কালিমার

ছাপ নিহিত ছিল আজ তা' ধুয়েমুছে আদর্শ আর্থ্য বৌদ্ধজাতি হিসেবে চাক্মা
তথা সকল বৌদ্ধদের সারাবিশ্বের দরবারে হাজির করতে চান এবং তিনি
তাঁদের গৌরব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চান ।

তাকে কেন্দ্র করে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন শুরু হয় । এর
উন্নয়নের অগ্রগতি ধীরে ধীরে সাধিত হচ্ছে । বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বেও
এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটছে তা' সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন ।
পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যের একনিষ্ঠ কর্ম প্রচেষ্টায়, আপামর
জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় এটি সম্ভব হচ্ছে । ইতিমধ্যে বৃহত্তর
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়ও অনেকগুলো শাখা বনবিহার গড়ে
উঠেছে । তাই আজ রাজ্জামাটি রাজবন বিহার কেন্দ্রীয় বিহার হিসেবে
চিহ্নিত । যে সব এলাকায় আজও শাখা বিহার গড়ে উঠেনি সে'সব
এলাকায়ও অতি সহসা শাখা বিহার গড়ে উঠা প্রয়োজন বলে আমি মনে
করি । শ্রদ্ধেয় বনভক্তের ভায়ায় এক ও অভিন্ন নীতির বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে
আদর্শ আর্থ্য বৌদ্ধ জাতি ও সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ।

আজ ঐতিহ্যবাহী একবিংশতিতম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব
উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি । এতে যারা সক্রিয়ভাবে কায়িক, বাচনিক ও আর্থিক
সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাদের
সবাইকে জানাই আমার এবং কমিটির পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ও
কৃতজ্ঞতা । স্বৈচ্ছাসেবক ভাইদের প্রতি রইলো আমার আশীর্বাদ । তাদের
দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের একনিষ্ঠতায় আমরা অনুষ্ঠানটি শৃংখলার সাথে
সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি । প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী
সংস্থার সকল সদস্য এবং অনুষ্ঠানে আগত সকল পূণ্যাধীদের জানাই
প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

“সকল প্রাণী সুখী হোক ।”

ইতি

সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা

সাধারণ সম্পাদক

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন, রাজ্জামাটি ।

১৭/১০/৯৪ ইং হইতে ১৭/১১/৯৪ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যমাটি রাজবন বিহার ও অন্যান্য শাখা বন বিহার সমূহে অনুষ্ঠিতব্য বৌদ্ধদের অন্যতম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের শিষ্য আমন্ত্রণে গমনের সফরসূচী :-

তারিখ	সময়	সফরের স্থান ও বিবরণ
২৭/১০/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর বন বিহার হতে মহালছড়ির উদ্দেশ্যে গমন।
২৮/১০/৯৪ ইং	সারাদিন	মহালছড়ি বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
২৯/১০/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে মহালছড়ি হতে প্রত্যাবর্তন।
৩০/১০/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর বন বিহার হতে বন্দুকভাঙ্গা মৌজায় ভারবুয়া চাপ শাখা বনবিহারের উদ্দেশ্যে গমন।
৩১/১০/৯৪ ইং	সারাদিন	ভারবুয়াচাপ শাখা বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
১/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর ভারবুয়া চাপ হতে শাক্য বনবিহারে গমন।
২/১১/৯৪ ইং		খারিক্য শাক্য বন বিহারে অনুষ্ঠান।
৩/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর রাজবন বিহার হতে লংগদু তিনটিলা বন বিহারের উদ্দেশ্যে গমন।
৪/১১/৯৪ ইং	সারাদিন	লংগদু তিনটিলা রাজবন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
৫/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর তিনটিলা বনবিহার হতে হাজাছড়া বৌদ্ধ বিহারে গমন।
৬/১১/৯৪ ইং		হাজাছড়া বৌদ্ধ বিহার হতে পিভ গ্রহণের পর রাজবন রাজবন বিহারে প্রত্যাবর্তন।
৭/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিভ গ্রহণের পর রাজবন বিহার হতে কাটাছড়ি শাখা বন বিহারের উদ্দেশ্যে গমন।

৮/১১/৯৪ ইং	সারাদিন	কাটাছড়ি শাখা বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
৯/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিণ্ড গ্রহণের পর কাটাছড়ি শাখা বিহার হতে রাজবন বিহারে প্রত্যাবর্তন।
১০/১১/৯৪ ইং		রাজবন বিহারে সার্বজনীন কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
১১/১১/৯৪ ইং		
১২/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিণ্ড গ্রহণের পর রাজবন বিহার হতে বরকল আয়মাছড়া শাখা বিহারের উদ্দেশ্যে গমন।
১৩/১১/৯৪ ইং	সারাদিন	বরকল শাখা বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান।
১৪/১১/৯৪ ইং	১২-৩০ মিঃ এর পর	পিণ্ড গ্রহণের পর বরকল আয়মাছড়া শাখা বনবিহার হতে জুড়াছড়ি শাখা বনবিহারে প্রত্যাবর্তন।
১৫/১১/৯৪ ইং	সারাদিন	সুবলং জুড়াছড়ি শাখা বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান। এবং পরবর্তীতে ইচ্ছানুযায়ী তথায় অবস্থান।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ :

বিষয় বস্তুর নাম	লেখক/সম্পাদকের নাম	পৃষ্ঠা নং
১। এস, সুখে বাস করি	শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার স্ববির	- ১৫
২। দানীয় সামগ্রীর প্রতি লোভের কুফল	শ্রীমৎ ভদ্রজী ভিক্ষু	- ১৬
৩। পঞ্চশীলের গুণাগুণ	শ্রীমৎ বৃক্ষজিৎ ভিক্ষু	- ১৭
৪। ধর্ম দর্শন	শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী ভিক্ষু	- ২১
৫। কর্মবাদী বৌদ্ধ ধর্ম	শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু	- ২৪
৬। ধর্ম ও তার পরিচয়	শ্রীমৎ সৌরজগৎ ভিক্ষু	- ২৫
৭। প্রকৃত বৃষল কাহাকে বলে	শ্রীমৎ বোধি মিত্র ভিক্ষু	- ২৬
৮। মানবের কর্তব্য	শ্রীমৎ সুদত্ত ভিক্ষু	- ২৮
৯। গৃহীদের জ্ঞাতব্য কিছু কথা	শ্রীমান ধর্মাচার শ্রামণ	- ২৯
১০। বোধিচিন্ত	বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	- ৩০
১১। প্রতীত্য সমুৎপাদ বা ভবচক্র	শান্তিময় চাক্মা	- ৩৩
১২। বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ ও তাঁদের গুণ বর্ণনা	সুনীতি বিকাশ চাক্মা (সঙ্ক)	- ৩৮
১৩। পঞ্চ উপাসক কাহিনী	সুনীল কুমার কারবারী	- ৪১
১৪। নব বর্ষে বনভণ্ডের দেশনা	ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া	- ৪৩
১৫। ব্রহ্ম বিহার	নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	- ৪৫
১৬। অভিজ্ঞা	মৈত্রী প্রসাদ খীসা	- ৪৮
১৭। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়	নির্মল কান্তি চাক্মা	- ৫০
১৮। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও ধর্ম	ডাঃ নিহারেন্দু তালুকদার	- ৫২
১৯। অনুশয়	প্রশান্ত কুমার দেওয়ান	- ৫৩
২০। ধ্যান চিন্তার বিশ্লেষণ	সজ্জিত কুমার চাক্মা	- ৫৪

কবিতা :

১। রাজবন বিহার, রাজবন	অমলেন্দু বিকাশ চাক্মা	- ৫৬
২। বেলা যখন বাড়ল	শ্যামল তালুকদার	- ৫৬
৩। কঠোর পণ	প্রভাসানন্দ (বিধুর) দেওয়ান	- ৫৬

এস, সুখে বাস করি

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার স্ববির
রাজবন বিহার।

আমরা সবাই সুখী হতে চাই। সুখে থাকতে সবাই ভালবাসি। আসলে প্রাণী মাত্রেই সুখাভিলাষী। কিন্তু সুখের আশায় পৃথিবীর প্রাণী সকল তথা মানবগণ সুখের প্রলোভনে পড়ে দুঃখই অধিক মাত্রায় পেয়ে থাকে। সুখের জীবন গড়তে গিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মহাদুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কুলের সন্ধান পায় না। তাই অনন্তকাল ধরে জন্মমৃত্যুর প্রবাহে অফুরন্ত দুঃখ ভোগ করতে করতে সংসার স্রোতে ভেসে চলে। যখন হঠাৎ করে কারো জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয় তখনই তিনি অপর জীবগণকে মুক্তির পথে অশ্রুসর হবার আহবান জানান। তিনি সেই অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ—যিনি ধর্ম পদে বলেছেন—“এস, এই পৃথিবীতে আমরা শত্রু-মানুষের মধ্যে শত্রুতা না করে শত্রুহীন হয়ে সুখে বাস করি। এস, হিংসুক মানবগণের মধ্যে আমরা হিংসা ভাব ত্যাগ করে, অহিংসা মনোভাব নিয়ে সুখে জীবন যাপন করি। এই সকল তৃষ্ণা—পরায়ণ, লোভী জনগণের মধ্যে এস, আমরা সবাই লোভ তৃষ্ণা বর্জন করে তৃষ্ণাহীন চিন্তে সুখে কাল যাপন করি। এই অজ্ঞানী জন সমাজের মাঝে আমরা জ্ঞানী হয়ে এস, সুখে শান্তিতে অবস্থান করি। এই জনগণ বিষয়াসক্ত; নানা ভোগ-তৃষ্ণায় জর্জড়িত। এস, সেই তৃষ্ণায় নিমজ্জিত

বিষয়াসক্ত জনসাধারণের মধ্যে আমরা আসক্তিহীন হয়ে সুখে জীবন ধারণ করি।”

বাস্তবিক, সুখী হতে হলে বা সুখে শান্তিতে বাস করতে হলে আমাদেরকে ঐ সকল বিষয় বাসনা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, যে সকল বিষয় বাসনার দ্বারা মানুষ দুঃখে পতিত হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ পাপ ধর্ম সমূহকে বিষয়াধীন কেউ সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করতে পারবে না। যেমন- পায়ে জুতা পরিধান করলে পৃথিবীর কাদা-ময়লা আবর্জনা হতে পা নির্মল রাখা সম্ভব। কাদা ময়লা পরিষ্কার করতে হয় না। তেমনি আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের চিন্তের মধ্যে ত্যাগভাব জাগ্রত করতে পারি তাহলে অবশ্যই সকল পাপ কালিমার সংস্পর্শ হতে রেহাই পেতে পারি। জগতে সকল পাপ ধর্মসমূহ বিরাজমান থাকলেও আমাদেরকে আর দুঃখগ্রস্ত করতে পারবে না।

সূতরাং বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অর্থাৎ অকুশল ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সবাই যদি আমরা নিজের মনকে সংযত করতে পারি, ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পারি প্রত্যেকের অন্তরকে, তবে সকলেই সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবো।

“সকল প্রাণী সুখী হোক।”



ত্যাগেই সুখ, ভোগেই দুঃখ।

- বনভন্তে।

ধর্মের অধীন ও কর্মের অধীন থাকিও না।

- বনভন্তে।

দানীয় সামগ্রীর প্রতি লোভের কুফল

শ্রীমৎ ভদ্রজী ভিক্ষু
রাজবন বিহার

ভগবান বুদ্ধ এক সময় বলিয়াছেনঃ

হে দায়ক দায়িকাগণ, ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানীয় সামগ্রী লোভ করিও না। বরং নিজেকে পুণ্য কার্যে জড়িত রাখিয়া অপরকেও পুণ্য কার্যে উৎসাহিত কর।

আর এমন ব্যক্তি আছে অজ্ঞানতা বশতঃ সেই দানীয় জিনিসগুলি লোভ করিয়া খায়, কেহ কেহ আত্মসাৎ ও নষ্ট করে। সেই দানীয় সামগ্রী লোভ না করিয়া সময়ে রক্ষা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত।

ভিক্ষু সংঘের দানীয় সামগ্রী বা সম্পত্তি লোভ করিয়া খাইলে অথবা নষ্ট করিলে, অপায়ে গমন করে। তিরোকুড় সূত্রে দেখা যায় এমন দায়ক দায়িকা ছিলেন, বুদ্ধ পূজার জন্য সংগৃহীত দানীয় বস্তুচুরি করিয়া নিজেরা খাইত এবং সন্তানদের ও খাওয়াইত। সেই দায়ক দায়িকাগণ সেই পাপ

কর্মের ফলে মৃত্যুর পর প্রেত হইয়াছিল। ঐ পাপিরা প্রেতলোকেই চারি বুদ্ধান্তর কাল পর্যন্ত মহাকষ্টে দিন অতিবাহিত করিয়াছিল। বর্তমান গৌতম বুদ্ধের সময়ে বিশ্বাসার রাজা কর্তৃক সেই প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান পুণ্যের ফল প্রদান করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। বিরানন্দই কল্পের আগে জগতে তিস্য ও ফুষ্য দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, -সেই সময় ঐ প্রেতগণ রাজা বিশ্বাসারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। দেখুন, প্রেতলোকে কত দুঃখ। কাজেই ভিক্ষু সংঘের দানীয় বস্তু চুরি করিয়া খাইলে অথবা আত্মসাৎ করিলে এবং হিংসা করিয়া নষ্ট করিয়া দিলে দেখা যায় তাহাদেরও বিশ্বাসারের ঐ আত্মীয়দের ন্যায় অপায় দুঃখ ভোগ করার আশঙ্কা রহিয়াছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

“সম্ভে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু।”



নিরামিষ খেলেই সাধু হওয়া যায় না। শীল পালনেই সাধু হওয়া যায়।
- বনভন্তে।

দয়া, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্মে নিভীক, সহিষ্ণু ও মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে।
- বনভন্তে।

চিত্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ মনই মুক্তির সোপান।
- বনভন্তে।

পঞ্চশীলের গুণাগুণ

শ্রীমৎ বৃক্ষজিত ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

অতীত-অনাগত-বর্তমান, সৰ্বকালের জ্ঞাতা ত্রিলোক-
গুরু ভগবান বুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনে ইহ-পারত্রিক সুখ সমৃদ্ধি ও
মঙ্গলের জন্য আদি কল্যাণ স্বরূপ যেই পঞ্চশীল অর্থাৎ পাঁচটি
অবশ্য প্রতিপালনীয় নীতি প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা
বাস্তবিকই একান্ত হিতকর। এই পাঁচটি নীতি কেবল
বৌদ্ধদের নয়, প্রত্যেকের পক্ষেও পরম প্রয়োজনীয়। সেই
জন্য ইহা সার্বজনীন। যাহারা কল্যাণ পথের যাত্রী তাহাদের
প্রত্যেকের এই নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। আর যাহারা
বৌদ্ধ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকনাথ বুদ্ধের আদি শিক্ষা
পঞ্চশীল পালনে ও অনুশীলনে যত্নপর নহেন, তাঁহারা প্রকৃত
পক্ষে নামে বৌদ্ধ মাত্র, কার্য্যত নহেন। সেই জন্য বলিতেছি
যিনি এই পঞ্চনীতি ধারণ, পালন করিবেন, তিনি ইহলোকে
বিজয় সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন এবং মৃত্যুর পর
উর্দ্ধতন লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিব্য সুখের অধিকারী
হইয়া অন্তিমে পরম শান্তিময় নির্বাণ সুখ লাভ করিবেন।

□ প্রথম শীল

প্রাণী হত্যা করিবেনা, এবং তাহার কারণ ও হইবেনা,
প্রাণী হত্যা অকুশল কাজে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক
-এই ত্রিবিধ উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন করিবেনা।
সমস্ত প্রাণীর প্রতি নিহিত দম্ভ, নিহিত শত্রু, লজ্জী, দয়ালু ও
সৰ্ব্ব জীবের প্রতি হিতানুকম্পী হইবে।

অঙ্গবিভাগ

প্রাণী, প্রাণী বলিয়া জানা, বধের চেতনা, মারিবার
উপক্রম, সেই উপক্রমের দ্বারা জীবনপাত করা, এই পাঁচটি
কারণ বিদ্যমান থাকিলে প্রাণী হত্যা অপরাধে অপরাধী হয়।
ইহার দ্বারা অন্নায়ু ও অকাল মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

প্রাণী হত্যা বিরতির ফল

প্রাণী হত্যা হইতে বিরত নর-নারীগণ জন্ম, জন্মান্তরে
লাভ করেন, খর্বতা-বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দোষ বর্জিত অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ ও দীর্ঘায়ু। তাঁহারা হন বীর, পরাক্রমশালী,
বেগবান, সু-প্রতিষ্ঠিত পদ বিশিষ্ট। দেহ হয় সুন্দর, কোমল,
পবিত্র ও মহাশক্তিশালী, বাক্যালাপে হয় কর্ণ সুখকর ও
জড়তা শূন্য। তাঁহাদের পরিষদ বর্গকে পারেনা কেহ বিভেদ
করিতে। তাঁহারা হন নিভীক ও রক্ষক।

পরের আঘাত জনিত অপমৃত্যু হইবে না তাঁহাদের,
তাঁহারা হন জন বহুল পরিবার সম্পন্ন, দেহ হয় রূপ
লাবন্যময়, সুশ্রী, সু-লক্ষণ ও সৌষ্ঠবময়, জীবন যাত্রা
নির্বাহ করেন চিরসুস্থ, শোকহীন ও বিচ্ছেদ বেদনাবিহীন
হইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে মৃত্যুর পর লাভ করেন
আনন্দময় স্বর্গ। তদ্ব্যতীত, প্রাণী হত্যার বহুবিধ দোষ ও প্রাণী
হত্যা বিরতির বহুবিধ গুণ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আজীবন
প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হইবেন।

□ দ্বিতীয় শীল

কাহার ও একখানা সূত্র নাল পর্য্যন্ত চৌর্য্য চিন্তে গ্রহণ
করিবেনা। চুরি কার্য্যে অপরকেও নিয়োজিত ও সাহায্য
করিবে না। যাহা পরষ, পর বিত্ত উপকরণ গ্রামগত অথবা
অরণ্যগত যাহার গ্রহণ চৌর্য্য বলিয়া অভিহিত হয়, তাঁহার
গ্রহীতা হইবে না।

অঙ্গবিভাগ

পর পরিগৃহীত দ্রব্য, পর দ্রব্য বলিয়া জানা, চুরি চিন্তা,
চুরি করিবার উপক্রম ও সেই উপক্রমে চুরি করা, এই
পাঁচটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে অপরাধে অপরাধী হয়।

কাহারও অজ্ঞাতে চুরি করিলে, শাস্তি না পাইলেও চৌর্য অপরাধে অপরাধী হইবে। চুরি কর্মের ফলে অতিশয় দরিদ্র কুলে জন্ম লাভ হয়।

চুরি কর্ম হইতে বিরতির ফল

চুরি কর্ম হইতে বিরত নর-নারীগণ জন্মে জন্মে লাভ করে থাকেন ধন ধান্য ও মনোজ্ঞ ভোগ সম্পদ। লব্ধ ভোগ সম্পদ নিখুঁতভাবে স্থায়ী হয় চিরকাল। অভিল্পিত বস্তু লাভ করেন অনায়াসে, তাঁহাদের সম্পত্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। রাজা, চোর, ডাকাত, অগ্নি, জল, যক্ষ, ও শত্রু কর্তৃক নষ্ট হয় না। মনুষ্যদের মধ্যে তাঁহারা লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্ব। এই সংপুরুষগণ অতীব সুখ-স্বাস্থ্যের মাধ্যমে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতঃ মৃত্যুর পর জন্ম ধারণ করেন দিব্য আনন্দময় স্বর্গধামে। সেই হেতু চুরি কর্মে বহুবিধ দোষ এবং চুরি কর্ম হইতে বিরতি বহুবিধ গুণ জানিয়া জ্ঞানীগণ আমরণ কাল পর্যন্ত চুরি কর্ম হইতে বিরত হইবেন।

□ তৃতীয় শীল

সম্মতিতে হউক, অথবা অসম্মতিতে হউক, পর স্ত্রী, কন্যা ও পুরুষের সহিত কাম সেবন করিবে না। ব্যভিচার (কামে মিথ্যাচার) পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার হইতে বিরত হইয়া, মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃ রক্ষিতা, ভগিনী রক্ষিতা, জ্ঞাতি রক্ষিতা, সখবা দম্ভবারিতা, এমন কি মাঙ্গ্যার্ণণ দ্বারা বাগ্দত্তা এইরূপ নারীতে ব্যভিচারে রত হইবে না।

অঙ্গ বিভাগ

অগমনীয় স্ত্রী লোক, মৈথুন সেবন চিন্ত, মার্গে মার্গ প্রতিপাদন, এই তিনটি অব্রতচার্য্য শীলের অঙ্গ। এখানে স্বেচ্ছায় ও বলাৎ কারের তিনটি অঙ্গ, অথবা অন্য উপায়ে সেবনসহ চারিটি অঙ্গ ব্যভিচারের জন্য কথিত। ইহার দ্বারা পুরুষের স্ত্রীত্ব লাভ ও পুরুষত্ব হানি হয়, পুরুষ অপুত্রকতা প্রভৃতি দোষে দুষিত হয়। স্ত্রী লোক নপুংসকত্ব অপুত্রকতা প্রাপ্ত হয়।

কামে মিথ্যাচার হইতে বিরতির ফল

কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত নর-নারীগণ হন শত্রুহীন, প্রিয় হন দেব নরের। উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য অনুপানীয়, মনোজ্ঞ পোষাক পরিচ্ছদ ও শয্যালাভ হয় প্রচুর পরিমাণে। সুখে নিদ্ৰা যান, সুখে জাগ্রত হন, জন্ম গ্রহণ করেন না চতুর্বিধ অপায়ে। পুরুষগণ লাভ করেন না স্ত্রীত্ব বা নপুংসকত্ব, আর নারীগণ লাভ করেন না নপুংসকত্ব ও বন্ধাত্ব, সতী সাধবী রমণীগণ ক্রমান্বয়ে লাভ করেন পুরুষত্ব। তাঁহাদের বিনষ্ট হয় শত্রু বল ও ক্রোধ বল। তাঁহারা হন প্রত্যক্ষদর্শী, সভা সমিতিতে গমন ও উপবেশন করেন নির্ভীক চিত্তে। কামে মিথ্যাচার বিরত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পর বর্দ্ধিত হয় প্রিয় ভাব, পরিপূর্ণ হয় ইন্দ্রিয় লক্ষণ সমূহ। শূন্য হয় শঙ্কা ও কৌতুহল, কাল যাপন করেন ভয় ও প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখবিহীন হইয়া। মৃত্যুর পর গমন করেন স্বর্গ লোকে। সেই কারণে কামে মিথ্যাচারে বিবিধ দোষ এবং ব্যভিচার হইতে বিরতির বহুবিধ গুণ জানিয়া সংপুরুষগণ আজীবন কামে মিথ্যাচার হইতে বিরত হইবেন।

□ চতুর্থ শীল

প্রানান্তেও মিথ্যা কথা বলিবেনা। তদ্বিষয়ে কাহাকে ও নিয়োজিত এবং সাহায্য করিবেনা। হাসিবার জন্যও মিথ্যা বলা অবিধেয়। ঠাট্টাচ্ছলে পিতার নামে পুত্রকে, পুত্রের নামে পিতাকে, ভ্রাতার নামে পিতাকে, শ্বশুরের নামে জামাতাকে এবং জামাতার নামে শ্বশুরকে আহবান করাও মিথ্যা কথার মধ্যে গণ্য হয়। মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত হইবে। সভামধ্যগত, পরিষদগত, জ্ঞাতি মধ্যগত, পুণমধ্যগত, রাজকুল মধ্যগত, সাক্ষীরূপে আনীত হইয়া “মহাশয়” যাহা জ্ঞান তাহা বল এইরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি যাহা জ্ঞানেন না, তাহা আমি জানি না বলেন, এবং জানিলে বলেন আমি জানিয়াছি। না দেখিলে বলেন, আমি দেখি নাই। এবং দেখিলে বলেন আমি দেখিয়াছি। এইভাবে আত্মহেতু, পরহেতু, যৎকিঞ্চিৎ

লাভহেতু সজ্ঞানে সত্যভাষী হইয়া মিথ্যাভাষী হইবে না। পিশুন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইবে। এখানে কিছু শুনিয়া তাহা সেখানে বলিবে না, ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্য। এইভাবে ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিলন কারী হইবে। সংহতদের উৎসাহদাতা, সমগ্ররাম, সমগ্ররত, সমগ্রনন্দি হইয়া, সমগ্র-করণী বাক্যের বক্তা হইবে। পৌরুষ বাক্য পরিত্যাগ করিয়া, পৌরুষ বাক্য হইতে বিরত হইবে। যেই বাক্য নির্দোষ, কর্ণ সুখকর (শ্রুতি মধুর) প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজ্ঞানোচিত (ভদ্র) বহুজনে কান্ত, বহুজন মনোজ্ঞ, তদ্রূপ বাক্যের বক্তা হইবে।

বৃথা বা সম্প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রলাপ হইতে বিরত হইবে। কালবাদী, ভূতবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হইবে। যথাকালে প্রণিধানযোগ্য বাক্যের বক্তা হইবে। যেই বাক্য শাস্ত্রীয় প্রাসঙ্গিক ও অর্থযুক্ত তেমন বাক্যের বক্তা হইবে।

অঙ্গ বিভাগ

অভূত বিষয়, প্রবঞ্চনা চিন্তা, মিথ্যা বলিবার চেষ্টা ও যাহাকে বলে সে জ্ঞাত হওয়া, মিথ্যা কথার এই চারিটি অঙ্গ ইহার দ্বারা মুখ দিয়া দুর্গন্ধ, তোৎলা ও কর্কশভাষী প্রভৃতি হইয়া থাকে

মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরতির ফল

মিথ্যা ভাষণে বিরত সত্যবাদী নর-নারীগণ জন্ম জন্মান্তর লাভ করেন সু-প্রসন্ন ইন্দ্রীয় নিচয়, বাক্য হয় মনোহরী। মধুর ও অনর্গল। দন্তরাজি হয় সমান, সুশ্রী-শুভ্র ও বিশুদ্ধ তাঁহাদের দেহ হয় নাতি দীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব, নাতি কৃশ, নাতি স্থূল। মধ্যাকায়, সুখ, সংস্পর্শ ও কমনীয়, মুখ হইতে নিঃসৃত হয় সর্বদা পদ্ম গন্ধ। পরিজনবর্গ তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা ও আদেশ পালন করেন প্রাণ পণে। তাঁহাদের জিহ্বা হয় পদ্ম নলের ন্যায় কোমল, রক্তিম বর্ণ ও পাতলা। তাঁহাদের অচিরেই বর্জন হয় ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্য এবং মৃত্যুর পর লাভ করেন স্বর্ণ রাজ্য। তদ্ব্যতীত মিথ্যা ভাষণে বহু

অন্তরায়, বহু দোষ, এবং সত্য ভাষণে বহু মঙ্গল ও বহুগুণ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আজীবন মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত হইবেন।

□ পঞ্চম শীল

প্রমাদপরায়ণ পিষ্টক অন্নাদি দ্বারা প্রস্তুত পাঁচ প্রকারের সুরা। (পুষ্প ও ফল রসাদি দ্বারা প্রস্তুত) পাঁচ প্রকার আসব, এই উভয় জাতীয় মদ্য ও গাঁজা অহিফেন, ভাঙু ইত্যাদি যে কোন প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিবেনা। এবং অপরকেও তাহা সেবনের জন্য উৎসাহিত করিবে না।

অঙ্গ বিভাগ

সুরা, পানের চেতনা, পান করিবার চেষ্টা, সেই চেষ্টায় পান করা, সুরা পানের এই চারিটি অঙ্গ। সুরাপায়ী নরকে, তির্য্যক যোনিতে, প্রেতলোকে ও অসুরলোকে উৎপন্ন হয়। ঔষধ স্বরূপ বা অতি সামান্য সুরাপান করিলে ও মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাগল, বিশ্রী, বোবা, মূর্খ প্রভৃতি হইয়া থাকে। পঞ্চশীলের মধ্যে এই শীল ভঙ্গ করাই সর্বাধিক মারাত্মক ফলদায়ক। কেননা এতে অন্তরায় হয় মার্গফল লাভের বা জীবন মুক্তির। পক্ষান্তরে ভগবান বুদ্ধ সিংগালোবাদ সূত্রে বলিয়াছেনঃ হে গৃহপতিগণ, সুরাদি নেশা দ্রব্য সেবনের ছয়টি বিষময় ফল আছে। যথা (১) অকারণে ধনহানি (২) অতিশয় কলহ বৃদ্ধি (৩) বিবিধ রোগোৎপত্তি (৪) দুর্গাম রটনা (৫) নির্লজ্জতা ও (৬) হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতা।

মাদক দ্রব্য সেবনের এই ছয়টি অপরিহার্য্য দোষ।

সুরা পানের বিরতির ফল

সুরা সেবন হইতে বিরত নর-নারীগণ অনাগত ও বর্তমান জন্মে অপ্রমত্ত ও স্মৃতিমান হয় এবং করণীয় কর্মে হন সুদক্ষ ক্ষিপ্ৰহস্ত। তাঁহাদের নিকট বিদ্যমান থাকে প্রজ্ঞা, উদ্যোগ, নিরালস্যতা, অজড়তা, অদক্ষতা, অপ্রমত্ততা ও নির্ভীকতা, প্রভৃতি গুণরাজি। তাঁহারা পরকে ঈর্ষা করেন না। তাঁহারা সর্বদা সত্য বাক্যই ভাষণ করেন। মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদ বাক্য ত্যাগ করেন। তাঁহারা দিবা-রাত্র

তন্মাল্যস্যবিহীন, কৃতজ্ঞ, অকৃপণ, দানপরায়ণ শীলবান সরল, ক্ষমাশীল, পাপের প্রতি লজ্জাশীল ও ভয়শীল, অকপট, মহাজ্ঞানী, মেধাবী, পণ্ডিত, ভালমন্দ বোধজ্ঞ। তাঁহারা মৃত্যুর পরে উৎপন্ন হন অনন্ত দিব্য সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ স্বর্গ লোকে। সুরা বা মদ্য সেবন হইতে বিরত নর-নারীগণ জন্মে জন্মে লাভ করে থাকেন এই মহাফল। সেইজন্য সুধীজন সুরা পানে বিরতির বহুবিধ মঙ্গলকর ও হিতকর জ্ঞানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমরণকাল পর্যন্ত সুরাপান হইতে বিরত হইবেন।

তদ্ব্যেতু ভিক্ষু শ্রামণের হটক বা উপাসক-উপাসিকা হটক, প্রত্যেকের একান্তই কর্তব্য শীল পালন করা। যেহেতু প্রাণী মায়েই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। সেই সুখ লাভ করা যায় শীলের মাধ্যমে। শীল রক্ষা ব্যতীত সুখ লাভের আর অন্য

কোন পন্থা নাই। ইহ কিংবা পর লোকে এই শীলরত্ন সম অন্য কোন রত্ন নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় লোক যদি এই পঞ্চনীতি পালন করিয়া মানিয়া চলিত, তাহা হইলে আইন, প্রণয়ন, বিচার ভবন ও বিবিধ দণ্ডদান আবশ্যক হইত না এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে রকেট বোম, এটম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রের ও প্রয়োজন হইত না। এই পঞ্চ নীতি মানব জীবনে পরম মুক্তির সোপান। এই জগতে যাহারা পঞ্চশীল লঙ্ঘন করে এবং শীল পালনে উদাসীন হয়, তাঁহারা নিজের কুশল কর্মের মূল নিজেই হনন করে এবং ইহ জন্মে নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই কারণে মুক্তি কামী সুখ-শান্তি অভিলাষী ব্যক্তি মায়েই অতি বিশুদ্ধভাবে শীল রক্ষা করিবেন। এই শীল রত্ন ইহকালে পরকালে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া অন্তিমে পরম শান্তি নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করায়।

“সকল প্রাণী সুখী হউক।

সকল প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্ত হউক।”



এম. এ. পাশ বা ট্রিপিটক বিশারদকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। বুদ্ধ জ্ঞানেই প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায়।

- বনভন্তে।

জীবন ও মনুষ্য সুখ ত্যাগ কর, নিবৃত্তি সুখ গ্রহণ কর এবং নির্বাণ গবেষণা কর।

- বনভন্তে।

আজ মানুষের মধ্যে আছে শুধু কামলোভ, সৌন্দর্য লোভ, ধনলোভ, রাজ্য লোভ এবং বিদ্যা লোভ- এগুলো হচ্ছে অর্ধমের পাগল এতে মনে হিংসা ও অজ্ঞানতা অবিরাম জাগে।

- বনভন্তে।

ধর্ম দর্শন

শ্রীমৎ বুদ্ধ শ্রী ভিক্ষু

ভগবানের দেশিত ধর্ম সন্দৃষ্টিক বা স্বয়ং দর্শনীয়। ভগবান বুদ্ধের এই ধর্ম স্বয়ং উপলব্ধির বিষয়। অন্যের কাছে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ইহা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্বয়ং আচরণ করেই একে উপলব্ধি করতে হয়। যিনি কাম-ক্রোধ-মোহ পরিত্যাগ করেছেন তার কাছে বুদ্ধ-দেশিত ধর্ম সমূহ অতি সহজেই বোধগম্য হয়।

তথাগত বুদ্ধের ধর্ম দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। যেই দর্শনে পঞ্চ বর্ণীয় ভিক্ষু প্রমুখ মহা প্রতিভা সম্পন্ন অসংখ্য কুলপুত্র আত্ম পরিচয় লাভ করেছিলেন, যেই দর্শনে বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ নিমিত্ত শ্রেষ্ঠী পুত্র যশ কুমার মাতা-পিতার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন না, যেই দর্শনে রূপাভিমानी রাজ্ঞী ক্ষেমা দেবীর রূপদর্প চূর্ণ হয়েছিল, সেই দর্শনে অশ্রাবক শারীপুত্র-মহামোদগল্যায়ন সংসার ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন; সেই দর্শনই প্রকৃষ্টতম দর্শন, সেই দর্শনই উত্তম দর্শন।

ধর্ম বিনা কোন প্রাণী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে না। মানুষের কাছে ধন-দৌলত-টাকা-পয়সা-সোনা-রূপা-হীরা-মনি মানিক্য প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু উহা মানুষকে প্রকৃত সুখ বা মুক্তি দিতে পারে না বরং উহা মুক্তির প্রতিবন্ধক। ধর্ম আচরণ করে ধর্মকে গৌরব-সংকার করে যতদূর সুখী হওয়া যায়, অন্য উপায়ে তা পাওয়া সুদূর পরাহত। একমাত্র ধর্মাচরণের মাধ্যমেই মুক্তি পাগল ভব পথিক ধর্মে অমৃত স্বাদ লাভ করতে পারে। ধর্মচারীকে ধর্মই রক্ষা করে। ধর্মাচরণের ফলে লৌকিক ও লোকোত্তর সুখের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁদের জন্য স্বর্গের দ্বার, মুক্তির দ্বার সর্বদা অব্যাহত। তাই ত্রিলোকবাসী সন্তুগণের ধর্মই একমাত্র শরণ। যাবতীয় ভোগ্য রসের মধ্যে ধর্ম রসই অমৃত রস। মনি মুক্তাদি মহার্ঘ বস্তুর মধ্যে ধর্ম রত্নই মহার্ঘ রত্ন এবং

জাগতিক সমস্ত দুঃখ বিনাশক ঔষধের মধ্যে ধর্মই পরম ঔষধ।

ত্রিলোক শরণ ধর্ম রসেতে উত্তম
রত্ন মাঝে ধর্ম রত্ন লোকে অনুপম।
ধর্ম করে ধ্রুব ভব দুঃখ বিনাশন
জাগত জীবনে ধর্ম কর আচরণ।

ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি সঙ্ঘিত পুণ্য প্রভাবে দুঃখ বহল স্থান-চারি অপায়াদি দুর্গতিতে গমন করেন না। তীর্থগ-প্রেত-অসুর-নরক এই চতুর্বিধ দুঃখ বহল স্থান হতে মানুষকে ধারণ বা রক্ষা করে বলে 'ধর্ম'। বস্তুতঃ যা' মানুষকে বা বুদ্ধিমান প্রাণীকে সংপথে চালিত করে বা পতন স্বভাব স্থান হতে রক্ষা করে, উর্ধ্বতন স্তরে নিয়ে যায়, তারই নাম ধর্ম। সুতরাং যেই ধর্ম মানুষকে উন্নতমুখী করে, নির্বাণ পথে চালিত করে, স্বর্গ-মোক্ষ লাভের সহায়ক হয়, তেমন শুচী-শুদ্ধ-পবিত্র ধর্ম আচরণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

যেহেতু ধর্ম-অধর্ম উভয়ে সমফল দায়ক নহে। অধর্ম নরকে নিয়ে যায়, ধর্ম তথা সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত করায়। তদ্ব্যতীত ধর্মাচরণ করা, দান দেয়া, জ্ঞাতীবর্গের হিতসাধন করা, সন্ধর্মে অপ্রমত্ত থাকা উত্তম মঙ্গল। (মঙ্গল সূত্রে কথিত) সন্ধর্মরূপ বিশুদ্ধ জল ব্যতীত চিত্তের মোহরূপ গাঢ় কালিমা বিশুদ্ধ হবার আর অন্য কিছুই নেই এই জগতে। নীহার যেমন তিরোহিত হয় সূর্য্যের প্রথর কিরণ সম্পাতে, তদ্রূপ অন্তরের পাপ কালিমা তিরোধান করার একমাত্র শক্তি রাখে সন্ধর্মের অজ্ঞেয় প্রভাব।

তাই মুক্তি কামী সংপুরুষগণ বুদ্ধ দেশিত নির্বাণ ধর্ম প্রীতি প্রমোদ্য চিন্তে আচরণ করে নির্বাণ পথ প্রশস্ত করেন। যারা ধর্মকে বিষবৎ বর্জন এবং অধর্মকে অমৃতবৎ গ্রহণ করে

জীবনে আত্ম প্রসাদ লাভ করে, তাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণ বৃথা। এরা ‘মানব’ নামধারী মাত্র, তারা পশুর চেয়েও হীন। এই সংসারে ধর্মহীন মানবের অকরণীয় পাপ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। হীন চেতনা মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মুক্তি কোথায়? সুখ কোথায়? একমাত্র ধর্মই মানুষকে পশু হতে শ্রেষ্ঠ করে। সুতরাং যীরা ধর্মকে নিজের জীবন স্বরূপ গ্রহণ করেন, ধর্মের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন, তাঁদের জীবনই ধন্য, তাঁদের জন্ম গ্রহণই সার্থক। সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখে পতিত হলেও কখনো ধর্ম ত্যাগ করেন না। জ্ঞান ও ধর্ম সমন্বয়ে যীরা জীবন পরিচালনা করেন, তাঁরাই সমাজে মহত্বের অধিকারী হন এবং পরলোকে ও পরম সুখের অধিকারী হন। যেহেতু বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম, একমাত্র জ্ঞানীরাই উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল হচ্ছে চারি আৰ্যসত্য। চতুরার্য সত্যের সাক্ষ্য করার নামই ‘নির্বাণ দর্শন’। অন্ধচক্ষে ঐ নির্বাণ ধর্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রজ্ঞা চক্ষেই উহা দর্শন করতে হয়। সুতরাং যীরা চারি আৰ্যসত্য দর্শন করেন, তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে দর্শন করেন। প্রাণী জগত মোহান্ধকারে আবৃত বলে চারি আৰ্যসত্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারে না। চারি আৰ্যসত্যের যথার্থ অনুপলব্ধি হেতু সত্ত্বগণকে এই দীর্ঘ সংসারে নানাকুলে, নানা শ্রেণীতে বার বার জন্ম নিতে হয়। চারি আৰ্যসত্য পরশ মনি স্বরূপ যার ছোঁয়াতে বা যার উপলব্ধিতে জীবনের অমরতা লাভ করা যায় এবং জরা-ব্যাধি-মরণ দুঃখ থেকে চিরতরের জন্য মুক্তি পাওয়া যায়। এক সময় ভগবান পাটলি গ্রাম হতে কোটি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় ভিক্ষুদের নিকট চারি আৰ্যসত্য লাভ সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ

‘না পেয়ে যথার্থ চারি সত্যের দর্শন,
দীর্ঘকাল বহু যোনি করেছে ভ্রমণ।
এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
ভবনেত্রী, তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন।
উৎপাতিত দুঃখ মূল, দুঃখের কারণ,
পুনর্ভব, পুনর্জন্ম নাহিরে এখন।

তাই ভগবান বুদ্ধ বস্তু নিম্নোষে ঘোষণা করেছেনঃ
“চতুসক্ বিনিমুত্ত ধর্ম নাম নখি” পৃথিবীতে মাত্র চারিটি সত্য বিদ্যমান। চারি সত্য বিনা ধর্ম থাকতে পারে না। যেমনঃ- দুঃখ সত্য, দুঃখ সমুদয় সত্য, দুঃখ নিরোধ সত্য ও দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আৰ্যসত্য।

দুঃখ সত্য কি? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, পরিতাপ, দৌর্যমস্য, হতাশা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, যা পাওয়ার ইচ্ছা তা না পাওয়ার দুঃখ, সংক্ষেপেতঃ পঞ্চ উপাদান স্বল্পই দুঃখ। দুঃখ সমুদয় সত্য কি? তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। তৃষ্ণার স্বভাব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হওয়া, আনন্দ উৎপাদন ও আসক্তি জন্মান। যে কেউ তৃষ্ণার কারণেই ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তৃষ্ণা তিন প্রকার, যথাঃ- কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণা। তৃষ্ণা হেতু একে অন্যের সাথে বিবাদ করে, বিবাদ করতে গিয়ে একে অন্যকে হস্তদ্বারা, দন্তদ্বারা, অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করে। ইহাতে কান্দারো মৃত্যু অথবা মৃত্যু সমদুঃখ হয়। তৃষ্ণা থেকেই আসে আসক্তি, আর এই আসক্তি বশতই সে সংসার চক্রে পুনঃ আবর্তিত হয় ও জরামৃত্যু-শোক প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে পীড়িত হয়। দুঃখ নিরোধ সত্য কি? পূর্বসিদ্ধি তৃষ্ণার বিষয়ে অপরিণীম বিরাগ, সর্বতোভাবে তৃষ্ণার দমন, সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণা পরিত্যাগ, পরিবর্জন, সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণার হাত হতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি। দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা সত্য কি? আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আৰ্যসত্য। আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা- (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম্যক বাক্য (৪) সম্যক কর্ম (৫) সম্যক আজীব বা সম্যক জীবিকা অবলম্বন (৬) সম্যক ব্যায়াম (৭) সম্যক শ্রুতি (৮) সম্যক সমাধি।

বুদ্ধ দেশিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্করূপ ধর্মনৌকায় আরোহন করে ভব মুক্তি পিপাসু সত্ত্বগণ নির্বাণ নগরে পৌছে। তাই বুদ্ধ বলেছেন- “মার্গের মধ্যে আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চারি আৰ্য সত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ

এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্ষুস্থান বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। দর্শন বিজ্ঞানের
জন্য এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই এক মাত্র পথ। ইহা ছাড়া অন্য
পথ নাই। তোমরা এই মার্গ পথ অবলম্বন কর। মার এতে
সম্মোহিত হয়ে পড়ে। এই উত্তম মার্গ অনুসরণ করে
তোমরা সর্বদুঃখের অবসান করো। দুঃখ শল্য উৎপাতনের

উপায় জেনেই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখনা করেছি।
ভব-দুঃখ অবসানের জন্য তোমাদিগকে উদ্যোগী হতে
হবে, তথাগতগণ কেবল উপদেষ্টা মাত্র। এই মার্গাবলম্বনে
ধ্যানীগণ মারবন্ধন হতে বিমুক্ত হন।”

সকল প্রাণী সুখী হোক,
সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক।
সাধু - সাধু - সাধু।।



যারা হীন ও সাধারণ ব্যক্তি তারা সংসারের নানাবিধ
অপকর্মে লিপ্ত থাকে।

- বনভন্তে।

শুধু মহাস্থবির হলেই বিশ্বাসী নয়। মার্গফল লাভীই প্রকৃত
বিশ্বাসী।

- বনভন্তে।

সদপুরুষ দর্শন, সঙ্কর্ম শ্রবণ, প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা, এবং
সঙ্কর্ম আচরণে নির্বাণ সাক্ষাৎ করা যায়।

- বনভন্তে।

নেগেটিভ-পজেটিভ সংযোগ স্থাপনে যেমনি বাতি জ্বলে,
ঠিক তেমনি পূর্ব জন্মের পুণ্য পারমী, ইহ জন্মের চেষ্টা ও
বুদ্ধের উপদেশে বুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়।”

- বনভন্তে।

কর্মবাদী বৌদ্ধ ধর্ম

শ্রীমৎ জ্যোতি সার ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাজশামাটি।

কুশল কর্ম মানুষকে সুফল প্রদান করে, সুগতি ভূমিতে লইয়া যায়। আর অকুশল কর্ম মানুষকে দুর্গতি প্রাপ্ত করে। যেই ব্যক্তির শীল নাই, সংযম নাই, সহনশীলতা নাই, ত্যাগ নাই, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই, সেই ব্যক্তি জীবনে হাজার বছর জীবিত থাকিলেও কোন পুণ্য কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেই ব্যক্তি ত্রিলোক শাস্তা সম্যক্ সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রদ্ধা সহকারে পালন ও ধারণ করেন, পঞ্চশীল, অষ্টশীল পালন করিয়া অনাবিল পুণ্য কার্যে উৎসাহী, নির্ভীক ও অটল থাকেন, তাহাদের চারি অপায়ে জন্ম ধারণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ নরকে গমন করেন না। বর্তমান মানুষ অন্মায়ু, ব্যাধিধনু, হীনবীর্য্য, বিপ্রী, ভোগ সম্পত্তিহীন কেন? মানুষের মধ্যে মৈত্রী নাই, দয়া নাই, করুণা নাই, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস নাই। শুধু কামাগ্নি, ঘেমাগ্নি, মোহাগ্নি। সেই কারণে মানুষের অবনতি ছাড়া উন্নতি নাই। তাই এত দুঃখ দুর্দশা। স্বীয় কর্মই জীবগণের সুখ-দুঃখের ফল প্রদান করে। কর্ম নিয়ন্ত্রণে অতিশয় সতর্কতা প্রয়োজন। কর্মই নিজের আশ্রয়, কর্মই মানুষকে হীন-শ্রেষ্ঠে, ধনী-দারিদ্রে বিভাগ করে। তথাগত বুদ্ধ বলিয়াছেন- “যেই সমস্ত কর্ম দোষাবহ ও নিরয়োৎপত্তি মূলক তাহা সম্পাদন করা অতিশয় সহজ। কিন্তু যাহা সুগতি মূলক নিজের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গল সাধন করে, এবং যাহা নির্ভাণ সুখপ্রদ সেইরূপ সৎকার্য সম্পাদন করা অতিশয় কঠিন।” কর্ম-কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার। এই সকল কর্মের

প্রত্যেকটি আবার কুশল ও অকুশল ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। ইহা আবার লৌকিক কুশল কর্ম ও লোকান্তর কুশল কর্ম ভেদে দ্বিবিধ। এখানে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, যেই কুশল কর্ম করিলে দেব ও মনুষ্য কুলে কাম্য সুখ উৎপন্ন হয় এবং কর্মান্তে অনুতাপ করিতে হয় না তদ সমস্ত লৌকিক কুশল কর্ম আর যেই কুশল কর্ম প্রভাবে জাতি (জন্ম) জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখের সম্পূর্ণ অন্তঃ সাধন করতঃ মুক্তি লাভে সক্ষম হওয়া যায় তাহা লৌকিক ধর্মের অতীত লোকান্তর কুশল কর্ম অর্থাৎ বিদর্শন ভাবনা। এই লৌকিক কুশল কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া লোকান্তর কুশল কর্ম আশ্রয় করা মুক্তিকামী মানবের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। অর্থাৎ যাহার ফল অবিমিশ্র আনন্দ ও প্রীতিময় চিন্তে ভোগ করা যায় অথচ কর্মান্তে অনুতাপ করিতে হয়না তাহা করাই ভাল। কর্ম বশেই জীব জন্ম লাভ করে এবং কর্মবশেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এবং যেখানে জন্ম, সেখানে জরা, সেখানে ব্যাধি, সেখানে মরণ। এই জন্ম, জরা, ব্যাধি মরণের তাড়নাতেই কেহ নির্মল সুখ ভোগ করিতে পারিতেছে না। সুখ-দুঃখ ও পাপ পুণ্যাদি সুফল বা কুফল, সুকর্ম বা দুষ্কর্ম অনুসারেই লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তকাল ঘূর্ণায়মান সংসার চক্রে মানুষের জন্ম জন্মান্তরে সুখ দুঃখের হেতু হইল কর্ম, কুশল কর্মে সুগতি লাভ এবং অকুশল কর্মে অপায় বা দুর্গতি প্রাপ্তি। কাজেই কর্মই ধর্ম।

ধর্ম ও তার পরিচয়

শ্রীমৎ সৌরজগৎ ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাজশামাটি

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সত্য হতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। সত্যই সবচেয়ে শক্তিমান ও কল্যাণপ্রদ।। ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষেরা বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য আপন আপন উপলব্ধ সত্যই জগতে প্রচার করেছেন। প্রত্যেক ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকের কতক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র রাজ কুমার সিদ্ধার্থ ব্যতীত এমন একটি নিদর্শন ও পাওয়া যায় না, যিনি রাজ পুত্র হয়ে সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সর্বজন কাম্য রাজ ভোগ, প্রাণপ্রিয়সম স্ত্রী-পুত্র ও মাতা-পিতাদি আপন জন ত্যাগ করে কঠোর সন্ন্যাস ধর্মকে বরণ করেছেন, এবং কঠোর সাধনার পর লাভ করেছেন চির অমৃত সুখ নির্বাণ। সে-ই অমৃত সুখ নির্বাণে অভিলাষ হয়ে তথাগত ভগবান বুদ্ধের পদাংক অনুসরণ করে অনেক কুলপুত্র ও লাভ করেছেন অজর অমর নির্বাণ। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন “অহিংসা পরম ধর্ম”। ইতিহাস পাঠে জানা যায়। ধর্ম যুদ্ধে পৃথিবী বহবার নর রক্তে প্রাণিত হয়েছে। তার কারণ ঈশ্বরের পৃথিবীতে মানুষের সুখ দুঃখের চেয়ে ঈশ্বরের আদেশই শক্তিমান বলে গৃহীত হয়েছে। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল, তথাপি ইহার প্রচারে একবিন্দু নররক্তে পৃথিবী কখনো কলঙ্কিত হয়নি এবং একবিন্দু পশু রক্তে বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম মন্দির অপবিত্র হয়নি। তার কারণ জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা হতে যার জন্ম এবং জীব দুঃখ নিবৃত্তিতে যার চরিতার্থতা, তা তো কখনো জীব দুঃখ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। ইহার পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত হওয়ার মূল কারণ ও তাই। জগতে যত ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে প্রায় সবের উৎপত্তির মূলে

নানা নামে সৃষ্টি কর্তা বা ঈশ্বর বিদ্যমান। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ধর্মের মূল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, খৃষ্ট ধর্মের প্রচারক প্রভু যিশু, পৃথিবীতে ধর্ম রাজ্য স্থাপনের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে God এর আদেশ শুনতে পান এবং নিজেকে God এর পুত্র বলে ঘোষণা করেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ চতুর্দশ বৎসর বয়সে আল্লাহর অহি বা বাণী লাভ করেন এবং নিজেকে আল্লাহর “পয়গম্বর” বা প্রেরিত পুরুষ বলে প্রকাশ করেন। আর হিন্দু ধর্মে যত ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ উৎপন্ন হয়েছেন, তাদের প্রায় সকলেই ঈশ্বর এর “অবতার” বলে স্বীকৃত হয়েছেন। উক্ত মহাপুরুষ সকলেই ঈশ্বরের বাণী মানব সমাজে প্রচার করে গিয়েছেন। অতএব, এ সব ধর্ম ঈশ্বর মূলক। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মোৎপত্তির মূলে কোন দেবতা বা ঈশ্বর নহেন। জীব দুঃখই রাজ কুমার সিদ্ধার্থকে রাজ প্রাসাদ হতে টেনে বের করে পথের ভিখারী করেছিল। এজন্য ধর্মোৎপত্তির মূল হচ্ছে জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা। ইহার আরম্ভ একবারেই অভিনব ও লৌকিক। জানীগণ বলেন, ধর্মে “অন্ধ বিশ্বাস” মানব সমাজের যত ক্ষতি করেছে, আর কিছুই তেমন করতে পারেনি। অগ্রগতি ও অন্তরায়কর মানবের যত শত্রু আছে তন্মধ্যে অজ্ঞানতা এবং আলস্য প্রধান। অজ্ঞানতা বিষয়ের যথার্থ স্বভাবকে আবৃত করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি উৎপত্তির কারণ হয়। তজ্জন্য অজ্ঞানতাই সবচেয়ে মানুষের বড় শত্রু। এই অজ্ঞানতা হতে রেহাই পাওয়ার উপায় হচ্ছে উত্তমরূপে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সাধন করা। তাতে লাভ হবে অফুরন্ত অনাবিল নির্বাণ সুখ।

“বিশ্বের সকল জীব সুখী হোক”

প্রকৃত বৃষল কাহাকে বলে

সংগ্রহেঃ শ্রীমৎ বোধি মিত্র ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

- ১। যেই ব্যক্তি ক্রোধী, হিংসুক, পাপেলিগু, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পরলোক ও দান কার্যাদিতে অবিশ্বাসী এবং মায়াবী তাহাকে বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ২। যেই ব্যক্তি একজ (পশু ইত্যাদি) দ্বিজ (পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণী সমূহকে হিংসা করে, যেই নির্মম এবং নির্দয়, সেইও বৃষল।
- ৩। যেই ব্যক্তি গ্রাম ও নগর সমূহ ধ্বংস করে, অবরোধ করে, অপদস্তকারী এবং ভেদ সৃষ্টিকারী সেইও বৃষল।
- ৪। যেই ব্যক্তি গ্রামে বা অরণ্যে অপরের অধিকারভূক্ত ধন চুরি করিয়া লইয়া আসে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ৫। যেই ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করিবার ইচ্ছায় গোপনে পলায়ন করে এবং চাইতে গেলে বলে, তোমার নিকট আমি ঋণী নহি, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ৬। যেই ব্যক্তি বিষয় সম্পদ লাভের ইচ্ছায় পথিককে হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎমাত্র দ্রব্যও গ্রহণ করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ৭। যেই ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসিত হইয়া আত্ম পর ও ধন হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাকে ও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ৮। যেই ব্যক্তি জ্ঞাতী ও বন্ধু বান্ধবদের স্ত্রীর প্রতি সহসা প্রিয়ভাব দ্বারা দূষিত হয় এবং অন্যায় আচরণ করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ৯। যেই ব্যক্তি বিগত যৌবন বৃদ্ধমাতা পিতাকে নিজের প্রভূত ধন সম্পত্তি ধাকা সত্ত্বে ও ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে না, সেইও বৃষল।
- ১০। যেই ব্যক্তি মাতা-পিতা ভ্রাতা ভগ্নি ও শ্বশুর শ্বশুরীকে হত্যা করে তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ১১। যেই ব্যক্তি হিতকথা বা মঙ্গল কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থে বা অবিষয়ে অনুশাসন করে, সংবুদ্ধি লইতে গেলে কু-বুদ্ধি দেয়, গোপনীয় স্থানে পরের অনর্থের জন্য কু-মন্ত্রণা করে, সেইও বৃষল।
- ১২। যেই ব্যক্তি পাপকর্ম করিয়া আমাকে কেহ না জানুক এই চিন্তা করিয়া গোপনে পাপ কার্য্য করে অথচ মুখে পবিত্রতা দেখায় তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ১৩। যেই ব্যক্তি পরগৃহে গিয়া উত্তম ভোজন গ্রহণ করে, কিন্তু নিজ গৃহে আসিলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিদান করে না, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।
- ১৪। যেই ব্যক্তি শ্রামণ-ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য যাচকের মিথ্যা বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চনা করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৫। যেই ভোজন বেলায় আগত শ্রামণ-ব্রাহ্মণকে
কটুক্তি বর্ষণ করে অথচ কিছু দেয় না, সেইও
বৃষল।

১৬। যেই ব্যক্তি মোহবশতঃ লাভ সংকার কামনা
করিয়া প্রকারান্তরে অসত্য প্রকাশ করে, সেইও
বৃষল।

১৭। যেই ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে করে, অন্যকে
অবজ্ঞা করে এবং অহংকার আত্ম গৌরব করে,
সেইও বৃষল।

১৮। যেই ব্যক্তি রোষক, দানান্তরায়কারী, পাপিষ্ঠ, কৃপন,

প্রবঞ্চক, পাপে ভয়হীন ও নির্লজ্জ তাহাকেও বৃষল
বলিয়া জ্ঞানিবে।

১৯। যেই ব্যক্তি বুদ্ধ অথবা তীহার শ্রাবক পরিত্রাজক বা
গৃহস্থকে লক্ষ্য করিয়া গালি দেয় সেইও বৃষল।

২০। যেই ব্যক্তি অর্হত না হইয়া ও অর্হত বলিয়া নিজে
জ্ঞাপন করে দেবতা-ব্রহ্মা ও মনুষ্যলোকে সে চোর
বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই ব্যক্তি ও বৃষল।

২১। জন্ম দ্বারা কেহ বৃষল হয় না। জন্ম দ্বারা
কেহ ব্রাহ্মণও হয় না। কর্মের দ্বারাই বৃষল ও ব্রাহ্মণ
হয়।

সকল প্রাণী সুখী হউক।



যাঁরা শীলবান, সদা তৎপর এবং সম্যক জ্ঞান লাভ করে
বিমুক্ত হয়েছেন, তাঁদের গতিবিধি মারের আয়ত্তের
বাইরে। - ধর্মপদ।

অল্প বুদ্ধি মুখেরা দুঃখদায়ক পাপ কাজের দ্বারা নিজেকেই
নিজের শত্রুতে পরিণত করে বিচরণ করে। - ধর্মপদ।

যে কাজ করে অনুতাপ করতে হয়, অশ্রময়নে কাঁদতে
কাঁদতে যার ফল ভোগ করতে হয়, তেমন কাজ না
করাই ভাল। - ধর্মপদ।

মানবের কর্তব্য

শ্রীমৎ সুদত্ত ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাজ্জামাটি।

মানব জীবনের উৎস সাধন এবং সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে যথাযথ কুশল কর্ম করা প্রত্যেক মানবেরই কর্তব্য। আসলে মানুষের প্রকৃত কর্তব্য কি? এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ দৃষ্ট দৈন্য ও বিপদাদি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংযম ব্রত শিক্ষা করা প্রয়োজন। আত্ম সংযম যোগীর লক্ষণ। সুখকামী মানুষ মাঝেই কিয়ৎ পরিমাণে বৈরাগ্য ও যোগীর ভাব থাকা প্রয়োজন। কারণ যোগ অভ্যাস দ্বারা দুর্নিবার ও অস্থির চিন্তকে বশীভূত করিতে হয়। নিজ চিন্তকে পরাজয় করিতে না পারিলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায় না। অদমিত, অসংযত চিন্ত মানবের পরম শত্রু। ধীর ও সংযমিত চিন্তে সদ্ব্যবসায় সাধনা করিলে ধর্মের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে অমূল্য মণি-মানিক্য আহরণ করা যায়। মানুষ ইচ্ছা শক্তিকে সংযম পথে চালাইতে পারিলে, অতীব অধম অবস্থা হইতেও মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, -লেখাপড়া জানিলেই সব কিছু জানা হইল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির বলেন তাহা নহে। আসলে লেখা পড়া জানিলেই যে সকল কার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে সেইটা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু মনীষীগণ শুধু সংযম ও বৈরাগ্য জ্ঞান-কর্ম করিয়াই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হইয়া আছেন। রত্নাকর অশিক্ষিত দস্যু হইয়া ও সংযত চিন্তে জ্ঞান কর্ম করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।”



সব সময় জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল নিয়া থাকা দরকার।
জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল নিয়া থাকিলে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি
হইতে পারে না।
- বনভন্তে।

যেমন দস্যু অঙ্গুলিমালা আঙ্গুল কর্তনের অভিপ্রায়ে ভগবান বুদ্ধের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়াও নিকটে পৌছিতে অসমর্থ হইলে রত্নাকর আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিলেন; “ওগো মুনি প্রবর, এত দৌড়িতেছ কেন?”

“তদুত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, “না, আমি—ত দৌড়াইয়া আছি। তুমি দৌড়িতেছ।”

“এই রহস্যের মর্মার্থ হইল ভবের ভোগ বাসনায় উন্মত্ত হইয়া রত্নাকরই পঞ্চকাম সুখে ধাবিত। কিন্তু উক্তবিধ কামসুখ ভোগ বাসনায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং সদ্ধর্ম স্থিত ও প্রশান্ত চিন্তে সংযত ও বৈরাগ্য—ভাব আনয়ন করিয়া পাপ মুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়— “একমাত্র সংযমিত চিন্তে জ্ঞান-কর্ম দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। লেখা পড়ায় বিদ্বান না হইলে ও বা নিতান্ত নিম্নস্তরে থাকিলেও সং সংসর্গে থাকিয়া সম্যকভাবে চিন্তা নমিত ও নিয়োজিত করিলে, অর্থাৎ সুশৃঙ্খলার সহিত শাস্ত্র মতে কার্য করিলে গৃহী বা ভিক্ষু সকলেই শান্তি ও সন্তোষের সহিত সাফল্য সহকারে জীবন যাপন করিতে পারেন এবং অন্তিমে পরম সুখ নির্বাণে পৌছাইতে পারেন।

গৃহীদের জ্ঞাতব্য কিছু কথা

শ্রীমাণ ধর্মচার শ্রামণ
তিনটিলা বনবিহার, লংগদু

সচরাচর দেখা যায়, কখনও ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষু সংঘ পিন্ধাচরণ বা আমন্ত্রণে গমন কালীন শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণের সাথে সাক্ষাৎ হইলেও দায়ক-দায়িকাবৃন্দ ভিক্ষুদের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া নিজাসনে বসিয়া থাকিতে কিংবা নিজ গন্তব্যে চলিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিলেও শ্রদ্ধাহীনের মত দেখায়, এবং ধর্মের প্রতিও অগৌরব প্রদর্শিত হয়।

কাজেই উপাসক, উপাসিকাগণের উচিত ভিক্ষু, শ্রামণের দর্শন লাভ হইলে, আসনে বসিয়া থাকিলে আসন হইতে উঠিয়া এবং হাঁটিয়া যাওয়ার সময় দেখিলে দাঁড়াইয়া অঞ্জলী বদ্ধ হইয়া থাকা। যদি অঞ্জলী বদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রসন্ন চিত্তে প্রীতি নেত্রে দর্শন করা উচিত। ইহাতে ধর্মের ও সংঘের প্রতি গৌরব প্রদর্শিত হয় এবং উপাসক, উপাসিকা গণের পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন, প্রীতি চিত্তে দর্শনজনিত পুণ্য প্রভাবে অনেক সহস্র জন্ম পর্যন্ত চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়না। সর্বদা উচ্চ কুলে জন্ম লাভ, দেব মনুষ্যলোকে শ্রী সৌভাগ্যের অধিকারী, তীক্ষ্ণ জ্ঞানবান প্রথর চক্ষু জ্যোতি ও দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

আর যাহারা ভিক্ষু শ্রামণ দর্শনে বিদ্রোহ ভাব পোষণ করে, অনর্থক বদনাম প্রচার করে, ভিক্ষু শ্রামণ গণের পূজা সংকার সহ্য করিতে পারে না, অগৌরব করে, অশ্রদ্ধা করে, ভিক্ষু শ্রামণগণের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কটু কথা বলে, মানসিক কষ্ট দেয়, তাহারা মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যদিও সৌভাগ্য বশতঃ মনুষ্য লোকে

জন্ম হইয়া থাকে, তথাপি তাহারা অন্ধ, বধির, বোবা, বিকলাঙ্গ হইয়া অতি দরিদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং নানা রোগ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া দিন কাটায়। সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। মরণের পরও তাহাদের সুখ শান্তি হয় না। ভিক্ষু শ্রামণগণের প্রতি প্রসন্ন হইলে তির্য্যক প্রাণীগণেরও সুগতি লাভ হইয়া থাকে।

আর অপ্রসন্নতা বশতঃ মনুষ্যও চারি অপায়ে পতিত হইয়া থাকে। যেমন গৌতম বুদ্ধের সময় বেদীয় পর্বতে আশ্রিত এক পেঁচক ভগবান ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা জনিত পুণ্য প্রভাবে মৃত্যুর পর স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। অপ্রসন্নতা বশতঃ এক ব্রাহ্মণ কাচ্চায়ন মহাস্থবিরকে বীদর বলায় সে নিজেই বীদর হইয়া জন্ম নিয়াছিল। কাজেই উপাসক উপাসিকা গণের উচিত ভিক্ষু শ্রামণের প্রতি সদাপ্রসন্ন থাকা।

ধর্ম দেশনা শ্রবণ-কালীন ও উপাসক উপাসিকাগণের বিভিন্ন বিধি নিষেধ মানিয়া চলা উচিত। যেমন টুপি, ছাতা মাথায় দিয়া, লাঠি ও অস্ত্র শস্ত্র ধারী হইয়া, ছুতা সেম্ভেল পরিহিত হইয়া, হস্তপদ জড়াইয়া, মস্তক কাপড়াবৃত করিয়া, স্থিতাবস্থা হইয়া (অর্থাৎ বসে ও না, দাঁড়াইয়াও না) ধর্ম শ্রবণ বিধেয় নহে।

এইরূপে স্থিত ব্যক্তিকে দেশনা করা বুদ্ধ কর্তৃক নিষেধকৃত। কাজেই উপাসক, উপাসিকাগণের উচিত ধর্মদেশনা শ্রবণ-কালীন উপরোক্তোক্ত সমস্ত বিষয়াদি ত্যাগ করত সুন্দরভাবে বসিয়া ধর্ম শ্রবণ করা। ইহাতে উপাসক উপাসিকাগণের মঙ্গল সাধিত হইবে।

“সকল প্রাণী সুখী হউক,
সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করুক।”

সাধু - সাধু - সাধু

বোধিচিহ্ন

শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

জীব মাঝেই তার চিন্তা বা চিন্তাধারা পরিচালিত হয়ে থাকে। মানুষের চিন্তা বা চিন্তা উন্নত বলেই মানুষ উন্নত জীব। আবার চিন্তার তারতম্যতা হেতু মানুষের মধ্যেও তারতম্যতা বিদ্যমান। যুগে যুগে বা কল্পে কল্পে বোধিচিন্তার অধিকারী মানুষই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে। কেননা, বোধিচিন্তা বা চেতনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ চেতনা যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অশেষ কল্যাণের আকর।

সাধারণভাবে বোধিচিন্তার অর্থ হল জ্ঞানচিন্তা বা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিন্তা। বোধি অর্থে জ্ঞান, আর চিন্তা অর্থে ভাবনা, চেতনা; চিন্তা বা মনকে বুঝায়। প্রকৃত অর্থে বুদ্ধত্ব আকাঙ্ক্ষা এবং লাভ করার জন্য গভীর আগ্রহকে বোধিচিন্তা বলা হয়। বুদ্ধবংশে (ত্রিপিটকের সুত্রপিটকানুগত গ্রন্থ) দেখা যায় সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের সাক্ষাতে নির্বাণ লাভে সক্ষম হলেও তিনি একাকী তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নির্বাণপদ বা নির্বাণ ধর্ম অধিগত হয়ে অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করে দেবমনুষ্য সমবিভ্যাহারে নির্বাণ সাক্ষাতকারই ছিল তাঁর কাম্য। লক্ষ্যণীয়ঃ কিম্বা একেন তিনেন পুরিসেন ধাম দসুসিনা। সম্ভবতঃ পাণ্ডিত্য সত্ত্বারেসং সদেবকং। (বুদ্ধবংশ) অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষের পক্ষে একা পরিভ্রাণ লাভের কোন সার্থকতা নেই, সর্বজ্ঞতা লাভ করে দেবমনুষ্য সমবিভ্যাহারে পরিভ্রাণ লাভ করাই সর্বোত্তম। এই মহত্তম চেতনাই বোধিচিন্তা। এবধিধ চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ ভাবীবুদ্ধ বা সম্যক সম্বুদ্ধ হতে হলে দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা এই দশবিধ পারমী পূর্ণ করতে হয়। বোধিসত্ত্ব এই দশবিধ পারমী পূর্ণ করার জন্য একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বোধিসত্ত্বগণ এই দশবিধ পারমী পূরণ করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ বুদ্ধ হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদয় সদৃশগাবলী আছে এবং যে সমুদয় সদৃশগাবলী দ্বারা এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মংগল উৎপন্ন হয় ঐ সবই সদ্ধর্ম। বুদ্ধগণ এই সদ্ধর্ম অধিগত হয়ে থাকেন এবং দেব মনুষ্যের হিতের জন্য তা প্রকাশ বা প্রচার করেন। সদ্ধর্মই হচ্ছে বুদ্ধশাসন অর্থাৎ বুদ্ধগণের অনুশাসন (Doctrine)।

প্রথমেই বলা হয়েছে বোধিচিন্তার যিনি ধারক, তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ ভাবীবুদ্ধ। সুমেধ তাপস নির্বাণলাভে সমর্থহলেও দীপঙ্কর বুদ্ধের সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা না করে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করে দেবমনুষ্য সমবিভ্যাহারে নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। হতে পারে তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের অতুলনীয় বিভূতি প্রত্যক্ষ করে তাঁর মত বিভূতিসম্পন্ন বুদ্ধ হবার জন্য তাঁর ইচ্ছা জন্মেছিল। আবার দেবমনুষ্য সমবিভ্যাহারে নির্বাণ লাভ করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। এতে বোঝা যায় দেবমনুষ্যের প্রতি তাঁর অনুকম্পা। অর্থাৎ নিজে সদ্ধর্ম অধিগত হয়ে দেবমনুষ্যগণকেও সদ্ধর্মে অভিজ্ঞ করে নির্বাণ লাভে সক্ষম করার আকাঙ্ক্ষা। তবে বুদ্ধ হওয়া কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং বুদ্ধত্বকারক ধর্ম দশবিধ পারমী পূরণ করতে জন্ম জন্মান্তরের কত কঠিন সাধনার প্রয়োজন তাও তিনি জানতেন। বুদ্ধবংশে দেখা যায়, সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভ করেই নিরাশায় গিয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে কি কি ধর্ম পূরণ করতে হবে সেগুলো নিবিষ্ট চিন্তে পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি একে একে দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা —এই দশবিধ পারমী বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন এক কিংবা শত জন্মেও এসব পারমী পূরণ করা সম্ভব নহে। এসব পারমী পূরণ করতে হলে অসংখ্য কালব্যাপী জন্ম হতে জন্ম পরিগ্রহ করে তাকে সাধনা করতে হবে। জন্ম হলেই মৃত্যু অবধারিত কাজেই কতবার মরণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। জন্ম, জরা,

ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ এবং ইপসিত বস্তুর অপ্রাপ্তি ইত্যাদি দুঃখ ভোগ করতে হবে তাকে। তদসংক্ষেপে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন দেবমনুষ্যের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। নিজে অপরিমেয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেও অপরের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করাই বোধিচিন্ত।

বুদ্ধ বলেছিলেন মানুষ মাত্রই সাধনার দ্বারা বুদ্ধ হতে পারে। প্রকৃত মানুষ হতে হলে মানবিক গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। বোধিচিন্ত মানবিক গুণাবলীর সমষ্টি অর্থাৎ মানবতার স্বরূপ। মানব জীবনে বেঁচে থাকতে হলে রা উন্নতি করতে হলে শক্তি সামর্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন। দুর্বল চিহ্ন মানব উন্নতি করতে পারে না। এ পৃথিবীতে নিজে কিছু দিতে না পারলে কিছু পাওয়ার আশা করা বৃথা - ইহা প্রকৃতির ধর্ম। কিছু দিতে হলে চিত্তের ঔদার্য বা উদারতা থাকতে হবে এবং এজন্য চিহ্নকে তৈরী করতে হবে। নিজের ধন সম্পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি জীবনকে পরহিতার্থে বা জীবের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করেই বোধিসত্ত্বগণ পারমী পূরণ করে থাকেন।

আচার্য শান্তিদেবকৃত “বোধিচর্য্যা” নামক গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের আচরণীয় ধর্মসমূহ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বোধিচিন্ত কিভাবে উৎপন্ন করা যায় এবং কি ভাবনা দ্বারা বোধিসত্ত্বগণ ভাবিত হন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরকম ভাবনায় ভাবিত হওয়া কল্যাণজনক। সকলের মংগলের জন্য এ প্রবন্ধে তা সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হল।

(ক) বহুকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর অবকাশ (অব্যাহতি, নিষ্কৃতি) লাভ এবং সমস্ত প্রাণীর শুভকর্ম সম্পাদনকে আমি আনন্দের সহিত অনুমোদন করছি। দুঃখীত প্রাণীগণ দুঃখ হতে মুক্ত হোক, সুখী হোক।

(খ) দেহধারীর সংসার দুঃখ হতে মুক্তিলাভকে আমি অনুমোদন করছি। সৎপুরুষগণের বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ প্রাপ্তিতে আমার পরমানন্দ বোধ হচ্ছে।

(গ) সর্বজীবের সুখবাহী এবং সর্বপ্রাণীর হিতসাধনকারী বোধিসত্ত্বগণের অগাধ সমুদ্রতুল্য মহান চিন্তোৎপাদনকে আমি অনুমোদন (অভিনন্দিত) করছি।

(ঘ) সর্বদিকে বিদ্যমান বুদ্ধগণের নিকট কৃতাজ্ঞা পুষ্টে প্রার্থনা করছি যে, যারা মোহবশতঃ দুঃখপ্রপাতে পতিত, তাদের জন্য ধর্মপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন।

(ঙ) পরিনির্বাণগামী বুদ্ধগণের নিকট আমি কৃতাজ্ঞা পুষ্টে যাহ্না করছি যে, তাঁরা যেন অনন্তকাল পর্যন্ত জগতে অবস্থান করেন, জগত যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়।

(চ) এইরূপে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে আমি যে পূণ্য উপার্জন করলাম তদ্বারা সমস্ত প্রাণীর সর্বদুঃখ উপশমিত হোক।

(ছ) ব্যাধি উপশম না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন রোগীদের ঔষধ হই। যেন বৈদ্য হই। আমি যেন তাদের সেবক হই।

(জ) অন্ন পানীয় বর্ষণ (বিতরণ) দ্বারা ক্ষুধা পিপাসার ব্যথা যেন মেটাতে পারি এবং কল্মাস্তরের দুর্ভিক্ষের সময় আমি যেন জনগণের পানভোজনের কারণ হই।

(ঝ) দরিদ্র প্রাণীগণের জন্য আমি যেন অক্ষয় ধন ভান্ডার হই এবং নানা প্রকার ব্যবহার্য উপকরণ রূপে যেন আমি তাদের সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকি।

(ঞ) আমার দেহ, ভোগ সম্পদ এবং অতীত, অনাগত, বর্তমান অর্থাৎ সর্বকালের শুভকর্মের ফল আমি জীবজগতের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করলাম।

(ট) সর্বত্যাগই নির্বাণ। আমি নির্বাণ প্রার্থী। অতএব, আমার যখন সমস্ত ত্যাগ করা প্রয়োজন, সমস্তই প্রাণীগণকে দান করা শ্রেয়।

(ঠ) সর্বদেহধারী জীবের যাতে সকল সুখের উদ্বেক হয়, তজ্জন্য আমার এই দেহ আমি উৎসর্গ করলাম। তারা ইচ্ছা করলে এই দেহ হত্যা করতে, নিন্দা করতে এবং ইহাতে ধূলি, গুথু, বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে পারে।

(ড) ক্রীড়া, হাস্য, বিলাস ইত্যাদি যা খুশী, যা তাদের সুখকর, তাই করুক। যে যে কার্যদ্বারা তাদের সুখলাভ হয়, আমার এই সমর্পিত কায়দ্বারা সেই কার্য তারা করুক। আমাকে উপলব্ধ করে যেন কারো অনর্থ না ঘটে।

(ঢ) যারা আমায় মিথ্যা নিন্দায় নিম্নিত করবে, যারা আমার অপকার করবে, যারা আমাকে উপহাস করবে তারা এবং অন্যান্য সকলেই যেন সন্তোষ লাভে সক্ষম হয়।

(ণ) আমি অনাথের নাথ, পথিকগণের পথ প্রদর্শক, পরপারে গমনকারীর নৌকা বা সেতু বা ভেলা। আমি যেন সমগ্র দেহধারী জীবের মধ্যে দীপান্বেশীর দীপ, শয্যা বিলাসীর শয্যা এবং দাসাধী গণের দাস হতে পারি।

(ত) আমি যেন প্রাণীগণের চিন্তামনি, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিদ্যা, মহৌষধ, কল্পতরু ও নিধিকুস্ত হতে পারি।

(থ) যেমন অতীত বুদ্ধগণ বোধিচিন্তা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যেক্রপভাবে বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষা ক্রমশঃ পালন করেছিলেন তেমনি জগৎ কল্যাণের জন্য আমিও বোধিচিন্তা গ্রহণ পূর্বক সেক্রপভাবে যথাক্রমে শিক্ষার অনুশীলন করব।

(ন) অন্ধ যেভাবে আবর্জনা স্তুপ হতে রত্নলাভ করে,

সেভাবে কোনরকমে আমার মধ্যে এই বোধিচিন্তা উৎপন্ন হয়েছে।

(প) এই বোধিচিন্তা এক রসায়ন বিশেষ। জগতের মৃত্যুরোধের জন্য ইহার উৎপত্তি। সমগ্র জগতের দরিদ্রতা মোচনের জন্য ইহা অক্ষয় নিধি।

বর্তমানে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত মানুষের মন প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হচ্ছে। লোভ, দ্বেষ (হিংসা), মোহ, মদ মাৎসর্যে পরিপূর্ণ হয়ে নানা অঘটন দ্বারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বিষময় করে তুলছে। পর বা জগত হিতার্থে চিন্তা নিবিশ্রিত থাকলে অর্থাৎ বোধিচিন্তার দ্বারা লোভ, দ্বেষ (হিংসা), মোহ, মদ মাৎসর্য পরিহীন হয়। মনে অনাবিল শান্তি বিরাজ করায়, ব্যক্তিগত জীবন সুখময় হয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুখময় জীবনের ফলশ্রুতিতে সমষ্টিগত জীবন ও সুখময় হয়ে উঠবে। সমষ্টিগত জীবনের শান্তিতেই বিশ্বশান্তি।

বোধিচিন্তা এভাবে ব্যবহারিক জীবনে অনাবিল শান্তি যেমন উৎপন্ন করে তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে বোধিচিন্তার অধিকারী ব্যক্তিকে এক অনন্ত পুণ্য শক্তির মহিমায় শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করে।



সম্যক জ্ঞানের সাহায্যে যিনি মুক্তিলাভ করেছেন সেই সুধীর ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য, কর্ম সবই শান্ত হয়।

- ধর্মপদ।

অইৎগণ যেখানেই বাস করেন- গ্রামে অথবা অরণ্যে, জলে অথবা স্থলে- সে স্থানই রমনীয়।

- ধর্মপদ।

প্রতীত্য সমুৎপাদ বা ভবচক্র

শান্তিময় চাকমা

প্রধান শিক্ষক

রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়

দুঃখ তার গ্রন্থ এ জগতে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে
জন্ম মৃত্যুর অনন্ত ডেউ। জন্ম লগ্নেই প্রতিটি জীব নিয়ে
আসে মৃত্যুর অমোঘ পরোয়ানা। শুধু তাই নয়। জন্মের
সাথে হাত মিলিয়ে যেমনি আসে মৃত্যু তেমনি আসে জরা
ব্যাদি রোগ শোকের দুঃসহ যন্ত্রণা। নদী প্রবাহের মত
অবিচ্ছিন্ন ভাবে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হলেও অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব
এর অন্তর্নিহিত সংযুক্ত ক্রিয়া সঙ্ঘর্ষে ওয়াকিবহাল নয়। তাই
পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়ে জেগে উঠা ব্যক্তি সত্তার মধ্যে আমিভূ
নিবদ্ধ করে রচিত হচ্ছে ‘আমি’ ‘আমার’ মিথ্যা ধারণা।
অথচ মিথ্যা অহং এ ‘আমি’ ‘আমার’ মধ্যেই চলেছে ধর্ম ও
সংস্কারের উৎপত্তি-লয়ের খেলা। তথাগত বুদ্ধ কার্য-কারণ
শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই তা ব্যাখ্যা করেছেন। এ কার্য-কারণ
শৃঙ্খলাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নামে অভিহিত। যার ধাতুগত
অর্থ একটিকে অবলম্বন করে অন্যটির উৎপত্তি।

পালি ‘পটিক সমুৎপাদ’ শব্দ থেকে বাংলা ‘প্রতীত্য
সমুৎপাদ’ শব্দ আগত। ‘পটিক’ শব্দের অর্থ ‘কারণ
বশতঃ’ এবং ‘সমুৎপাদ’ শব্দের অর্থ ‘উৎপত্তি’। এ উভয়
শব্দের অর্থ দাড়ায় কারণ বশতঃ উৎপত্তি। ‘পটিক’ সমুৎপাদ
শব্দের আক্ষরিক অর্থ কারণবশতঃ উৎপত্তি হলেও এটা
সমুদয় হেতু সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ১২টি
পরস্পর নির্ভরশীল কারণ ও ফলের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রতীত্য সমুৎপাদ পৃথিবীর ক্রম বিকাশের দার্শনিক
মতবাদ নহে। কিংবা জীবন স্ক্রণের রহস্য উদ্ঘাটনের
সম্মানও নয়। এটা হচ্ছে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের সঙ্গে অত্যন্ত
ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বঁধা কার্য-কারণের অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক
নিয়ম।

প্রতীত্য সমুৎপাদে অবিদ্যাকেই পুনর্জন্মের মূল কারণ
বলা হয়। তাই বলে জীবের অস্তিত্বের মূলে অবিদ্যা নয়।

অবিদ্যা থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি নয় বা বিশ্ব চরাচর ও
বিশ্ব প্রজ্ঞন তার ক্রিয়া নয়। অবিদ্যা একটি অবস্থার নাম,
যা থেকে আর একটা অবস্থার উদ্ভব ঘটে। জীবন চক্রে
সত্তরনের প্রধান কারণ হচ্ছে দুঃখ সত্য সঙ্ঘর্ষে, তার কারণ
সঙ্ঘর্ষে, দুঃখ থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায় এবং দুঃখ মুক্তির
নির্দিষ্ট পথও আছে সে সঙ্ঘর্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। সত্য
উপলব্ধির অভাব বা কোন ব্যক্তি বা বস্তু সঙ্ঘর্ষে প্রকৃতভাবে
না জানাই অজ্ঞানতা। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, অবিদ্যা বা
অজ্ঞানতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চনা যেখানে আমরা দীর্ঘ
সময় ধরে পরিভ্রমণ করছি। অজ্ঞানতা ধ্বংস হয়ে যখন
জ্ঞানোৎপন্ন হয় তখন সমস্ত কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে
যায়। তিনি আরো বলেছেন, যীরা প্রবঞ্চনা বা অজ্ঞানতা
ধ্বংস করে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করেছেন তাঁরা আর জীবন
চক্রে পরিভ্রমণ করবেন না। কার্য-কারণ সম্পর্ক তাঁদের
জন্ম বন্ধ।

অবিদ্যার উপরে নির্ভর করেই সংস্কারের উৎপত্তি।
এখানে সংস্কার বলতে বুঝায় কুশল বা পুণ্য চেতনা অকুশল
বা অপুণ্য চেতনা এবং আনন্দ বা অরূপ চেতনা যার
সমন্বয়ে গঠিত হয় কর্ম। আর এ কর্মই হচ্ছে ভববীজ অর্থাৎ
পুনর্জন্মের কারণ। বলা বাহুল্য চেতনাই কর্মে পর্যবসিত
হয়। কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া জীবের জীবন যাত্রা অচল। দান,
শীল, পূজা ইত্যাদি পুণ্য কর্মের প্রভাবে চিত্ত যখন ভক্তিতে,
প্রেম ও পবিত্রতায় উদ্দীপ্ত হয় তখন সে চেতনাকে বলা হয়
কুশল চেতনা। কুশল চেতনা মূলতঃ একটি হলেও
চিত্তোৎপত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোবৃত্তির জন্য তার সংখ্যা
দাড়ায় আটে। ফলে কুশল চেতনা সমূহ কখনো জ্ঞান
সমন্বিত, কখনো জ্ঞান বিরহিত, কখনো স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা
কখনো প্ররোচিত। পাঁচ প্রকার রূপচর চেতনাও কুশল

চেতনার অন্তর্গত। রূপচর চেতনা নির্মল ধ্যান চিত্ত যা মনের শান্ত সমাহিত অবস্থা বজায় রাখে। অন্য কথায় বলা যায় নির্বাণের লক্ষ্যে মহা পদক্ষেপ। লোভ, দ্বेष এবং মোহ সমন্বিত অকুশল সংস্কার সংখ্যায় ১২টি। এ চেতনা সমূহ মিথ্যা ধারণায় আচ্ছন্ন। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত, অনিত্য বিষয় সমূহকে স্তব্ধ ও নিত্য বলে মনে করে। আনন্ড সংস্কারের ৪ প্রকার অরূপচর চেতনা সমূহ ধ্যান চিত্ত হলেও জাগতিক কুশল-কুশলের উর্ধ্বে নহে। বায়ান্ন প্রকার চিত্ত-চৈতন্যিক বা মন ও মনোবৃত্তির মধ্যে পঞ্চ স্ফেরের অন্যতম স্ফের সংস্কার ৫০ প্রকার মন মানসিকতাকে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য লোকোত্তর চিত্তের ৪টি চেতনা সংস্কার হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ এগুলো নিজেই অবিদ্যা ধ্বংসে সহায়ক। এ চিত্ত সমূহ করায়ত্ত হলে সত্তা সমূহ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, সীমা থেকে অসীমের দিকে, বন্ধন থেকে মুক্তির পানে মহাযাত্রা করে পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে অবস্থান নেয় অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

অপার্থিক জগতে প্রজ্ঞা এবং পার্থিক জগতে চেতনাই প্রাধান্যপূর্ণ। সকল কুশল-অকুশল চিন্তা, কথা এবং কাজ সংস্কার বা চেতনার অন্তর্ভুক্ত। ভাল বা মন্দ কর্ম সমূহ যে গুলো সরাসরি অবিদ্যায় প্রোথিত কিংবা অনির্দিষ্টভাবে অবিদ্যার সঙ্গে জড়িত সেগুলো অবশ্যই প্রয়োজনীয় ফল প্রদান করবে এবং সংসার বর্ষে আবর্তিত হবে। তাই অকুশল কর্ম, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা থেকে জীবনকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। তথাগত বুদ্ধ তাঁর প্রদর্শিত ধর্মকে ভেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন যা দিয়ে জীবন সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায়। বুদ্ধ এবং অহিংসার কর্ম সমূহ যেহেতু অবিদ্যামুক্ত তাই সেগুলো সংস্কার হিসেবে অভিহিত হয় না। অকুশল কর্মেই অবিদ্যা সবচেয়ে প্রবল। অপর পক্ষে কুশল কর্মে ইহা অবিকশিত। সেহেতু কুশল এবং অকুশল এ উভয় কর্ম অবিদ্যা প্রসূত।

সংস্কার থেকে উদ্ভব ঘটে বিজ্ঞানের। এখানে বিজ্ঞান বলতে বুঝায় মন বা চিত্ত। দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক

অবশ্যস্বাভাবিক। কিন্তু তা মুখ্য নয়, গৌণ। কারণ মানসিক বৃত্তিসমূহ ব্যতিরেকে মনের কোন কাজ সাধিত হতে পারেনা। অভিধর্মে তিনটি জগৎ বর্ণিত। কাম জগৎ, রূপ জগৎ এবং অরূপ জগৎ। কাম জগতে কাম্য বিষয় অবলম্বন করে যে চিত্তের উদয় হয় তাকে বলা হয় কাম চিত্ত। এ চিত্ত পাপবিদ্ধও হতে পারে কিংবা শোভনও হতে পারে। কামজগতের উর্ধ্বে রূপজগৎ এবং তার উর্ধ্বে অরূপ জগৎ। বলাবাহুল্য, ধ্যান সাধনার মধ্য দিয়েই এ'দুই জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে হয়। এ'চিত্ত সমূহ মূলতঃ ধ্যান চিত্ত। তা সত্ত্বেও এ চিত্ত ভবমুখী অর্থাৎ লৌকিক। জাগতিক সমস্ত পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে নির্বাণালম্বনে যে চিত্তের উদয় হয় তা হচ্ছে লোকোত্তর চিত্ত। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে যে বিজ্ঞান বা মন তা হচ্ছে প্রতিসন্ধি চিত্ত। নদী প্রবাহে যেমন উৎস বা আদি, মধ্য এবং মোহনা এ তিনটি স্তর বর্তমান তেমনি সত্তা সমূহের জীবন প্রবাহেও প্রতিসন্ধি চিত্ত বা উৎস, ভবাজ চিত্ত বা মধ্য এবং চ্যুতি বা মোহনা এ তিনটি স্তর বর্তমান। এখানে বিজ্ঞান হচ্ছে আদি। তাই বিজ্ঞানকে বলা হয় প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান। এবং এটাই প্রাথমিক চেতনা যা একজন সত্তা মাতৃ গর্ভে উপলব্ধি করে।

বিজ্ঞান থেকে আসে নাম রূপ অর্থাৎ মানসিক ও ভৌতিক দেহ। আমরা জ্ঞানি পিতা-মাতার শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযুক্তির ফলে মাতৃগর্ভে ক্রণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম তত্ত্ব অনুযায়ী পিতা-মাতার শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সঙ্গে প্রতিসন্ধি চিত্তের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার মিলনের সময় যদি জীব গর্ভধারণের সময় না হয় কিংবা যে সত্তার জন্ম হবে সে সত্তা যদি বর্তমান না থাকে তাহলে জীবনের সঞ্চার হবে না। আবার জীব গর্ভ ধারণের সময় স্বামীজীবীর মিলন হলেও যদি জনালাভী সত্তার উপস্থিতি না থাকে তাহলেও গর্ভের সঞ্চার হবে না। স্বামী-জীবীর মিলনের সময় জীব গর্ভধারণের সময় হলে এবং একই সময়ে জনালাভী সত্তার উপস্থিতি ঘটলেই তবে ক্রণের সঞ্চার হয়। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চেতনায় অতীতের সমস্ত

প্রভাব, বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা ঐ ব্যক্তির জীবন প্রবাহে অবিকশিত অবস্থায় থেকে যায়। এ প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চেতনা পূত পবিত্র। কারণ এটা অকুশলের মূল কাম-লালসা, ঘৃণা ও প্রবঞ্চনা মুক্ত অথবা কুশল কর্ম সমন্বিত। প্রতি সন্ধি চিন্তের উদ্ভবের সাথে সাথে উৎপত্তি হয় নামরূপ বা শারীরিক অবয়ব। নামরূপকে যেমন ভিন্ন ভিন্নভাবে তেমনি একত্রিত ভাবেও বুঝার প্রয়োজন। কারণ অরূপ লোকে উৎপত্তি হয় শুধু নাম বা চিন্ত। আবার আসন্ন লোকে উদ্ভব হয় শুধু রূপের। কিন্তু কাম লোক ও রূপ লোকে নাম ও রূপ এ'উভয়ের একযোগে উদ্ভব ঘটে।

প্রতিসন্ধি চেতনায় নাম স্বক্দের সঙ্গে একযোগে উদ্ভব হয় বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার আর রূপ স্বক্দের সঙ্গে উৎপত্তি হয় কায় বা দেহ, ভাব বা লিঙ্গ এবং বধু বা চেতনার স্থান। রূপ বা ভৌতিক দেহ গঠিত হয় চারটি উপাদানে। এগুলো হচ্ছে (ক) পৃথিবী বা মাটি (খ) অপ বা পানি (গ) তেজ বা তাপ এবং (ঘ) মরুৎ বা বায়ু। এগুলোর উৎপত্তির ফল স্বরূপ জন্ম নেয় (ঙ) বর্ণ (চ) গন্ধ (ছ) রস (জ) ওজঃ (ঝ) জীবেতেন্দ্রিয় এবং (ঞ) দেহ। উপরোক্ত উপাদান সমূহের প্রথম ৯টি উপাদানে স্থির হয় লিঙ্গ এবং বধু বা চেতনার স্থান। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে একজন সত্তার গর্ভে উৎপত্তির সময়েই অতীত কর্মদ্বারা নির্ধারিত হয় লিঙ্গ। গর্ভ ধারণ মুহূর্তে কার্যকর ক্ষমতার অধিকারী চেতনার স্থান মস্তিষ্কে না হৃদয়ে তা অবিকশিত থাকে। এ চেতনার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে তথাগত বুদ্ধ নির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করেননি। তবে সে সময়ের প্রচলিত মতবাদ কার্ডিয়াক থিওরী অনুযায়ী চেতনার স্থান হৃদয়ে। শ্রদ্ধেয় অশ্বঘোষ এবং অনুরুদ্ধও একই মত ব্যক্ত করেন। তথাগত বুদ্ধ এ'মতবাদ যেমন সমর্থন করেননি তেমনি বিরোধিতাও করেননি।

জীবের জৈব প্রয়োজন আছে। আর সে জৈব প্রয়োজন মিটানোর জন্য বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠা স্বাভাবিক। তাই ভ্রূণাবস্থায় মনো-কারিক দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে ধীরে ধীরে যুক্ত হয় ছয় ইন্দ্রিয় দ্বার। এ ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারকে বলা হয় ষড়ায়তন। ষড়ায়তন যুক্ত এ'মানব যন্ত্র

প্রারম্ভে অত্যন্ত সহজ সরল। কিন্তু শেষে পরিবর্তিত হয় জটিল যন্ত্ররূপে। অপর পক্ষে সাধারণ যন্ত্র প্রারম্ভে অত্যন্ত জটিল কিন্তু তৈরী শেষে হয়ে যায় সহজ, সরল। ফলে একটি মাত্র আঙ্গুলের শক্তিও বড় বড় যন্ত্র সহজে পরিচালনা করতে পারে। ষড়ায়তন বিশিষ্ট মনুষ্য যন্ত্র আত্মার ন্যায় কোন পরিচালক ছাড়াই পরিচালিত হতে থাকে। ষড়ায়তন সমূহ হচ্ছে চক্ষু আয়তন, শোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন এবং মনায়তন। এদের স্ব স্ব কার্যকারিতা যেমন আছে তেমনি আছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা আলম্বন। আলম্বন সমূহ যেমনঃ- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, কায় এবং মনোগোচর বিষয়ের সঙ্গে ছয় ইন্দ্রিয় দ্বার যুক্ত হয়ে স্ব-স্ব ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

ছয় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে কোন বিষয়ের সংযোগ ঘটাই স্বাভাবিক। ষড়ায়তন এবং আলম্বন সমূহের সংযোগের ফলে উদ্ভূত চেতনাই স্পর্শ যা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক এবং মানসিক। ইন্দ্রিয় অনুসারে এগুলোর নামকরণ। যেমনঃ চক্ষু-স্পর্শ, শ্রোত্র-স্পর্শ, ঘ্রাণ-স্পর্শ, জিহ্বা-স্পর্শ, কায়-স্পর্শ এবং মন-স্পর্শ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের স্পর্শ বা সংযোগ হয় বলে চিন্তে বিভিন্ন ধারণার উদ্বেক হয়।

ষড়ায়তনের সঙ্গে আলম্বনের সংযোগ ঘটলেই অনুভূতি জেগে উঠে। এ অনুভূতিকে বলা হয় বেদনা। এ বেদনা হতে পারে সুখের, দুঃখের কিংবা উপেক্ষার। এ বেদনার ফলে ইহ জন্মের বা পূর্ব জন্মের কোন কাজের কাম্বিত বা অনাকাম্বিত ফল ভোগ করতে হয়। কোন কাজের ফল উপলব্ধির জন্য এ মানসিক অবস্থা ছাড়া অন্য কোন আত্মা নেই। সুখ এবং দুঃখ মূলতঃ শারীরিক অনুভূতি। আবেগতাড়িত সুখ এবং দুঃখ মানসিক অনুভূতিতে পরিণত হয়। আনন্দ মিশ্রিত সুখকে সৌমনস্য এবং বিষাদ মিশ্রিত দুঃখকে দৌর্মনস্য বলা হয়। অভিধর্মের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল মাত্র একটি চেতনাই দুঃখ সহযোগে উৎপন্ন। তদ্রূপ সুখ বেদনা ও একটি। দুটির সমন্বয়ে উৎপত্তি ঘটে দৌর্মনস্য বেদনার। ৮৯ প্রকার চেতনার মধ্যে ৮৫টি চেতনাই সৌমনস্য অথবা উপেক্ষা বেদনায় পর্যবসিত। উল্লেখ্য,

লোকোত্তর চেতনা জাগতিক কুশলাকুশলের অতীত সকল পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে।

বেদনার কারণেই তৃষ্ণা জাগে যা অবিদ্যার মত প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির অন্যতম কারণ। সকল জীব আপনার তৃষ্ণা জালে আপনি জড়িত। জগতে তৃষ্ণা বা কামনার অন্ত নেই। এ তৃষ্ণা তিন প্রকার। কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণা। কামরসে সিদ্ধ বা কামনালিপ্ত লালসাকে বলা হয় কামতৃষ্ণা। এটা ভোগ তৃষ্ণা নামেও কথিত। অনিত্য অশাস্ত্র জগৎকে যখন নিত্য এবং শাস্ত্র বলে ভাবি, কামনা করি তখন এ মিথ্যা ধারণা ভবানুরাগে পর্যবসিত হয়। এ জাতীয় তৃষ্ণাকে বলা হয় ভব তৃষ্ণা। মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, সুখ-দুঃখ বলে কিছুই নেই। সুতরাং খাও-দাও-ফুটি কর এ ধারণায় মন আছন্ন হলে তাকে বলা হয় বিভব তৃষ্ণা।

ভোগে তৃষ্ণা মিটেনা। তৃষ্ণা বরং প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তৃষ্ণার এ প্রাবল্য থেকেই আসে উপাদান যার অর্থ দৃঢ়ভাবে ধারণ বা গ্রহণ করা। এ উপাদান চার প্রকারঃ- কামোপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান এবং আত্মবাদোপাদান। ইন্দ্রিয় সন্তোষের দৃঢ় আসক্তিই কামোপাদান। মিথ্যা ধারণায় আছন্ন মনের আসক্তিকে বলা হয় দৃষ্টি উপাদান। অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে চরম লক্ষ্যের পথ ভেবে একাত্ম অনুভব করলে তাকে বলা হয় শীলব্রত উপাদান। আমার দেহ আমার মন অর্থাৎ আমি-ত্ব-মমত্ব বোধে নিমগ্ন হলে তাকে বলা হয় আত্মবাদোপাদান।

উপাদানের দৃঢ় আসক্তি জীবকে কর্মে লিপ্ত করে। কর্মের অনুষ্ঠান রূপে কর্মবীজ উদ্ভূত হলে উৎপত্তি ভব বা বিশ্বজগৎ অবশ্যজারী। ভব দুই প্রকার। কর্ম ভব ও উৎপত্তি ভব। সুকর্ম দুর্গতিতে আর দুষ্কর্ম দুর্গতিতে পরিচালিত করে। অর্থাৎ জীবকে আপন আপন কর্ম অনুযায়ী অনন্ত পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ভবের কারণেই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম। এজন্ম হতে পারে দেবকুলে, মনুষ্য লোকে কিংবা তির্যককুলে। জন্ম

যেখানেই হোক আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ বা অন্য প্রাণীর জন্মের হেতু পরিলক্ষিত হয় যৌন মিলনে। কিন্তু যৌন মিলনই যদি জন্মের মৌলিক কারণ হয়ে থাকে তাহলে মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ কেন? কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিৎ, কেউ অন্ধ, কেউ বধির, কেউ স্বপ্নায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ ভাগ্যবান, কেউ ভাগ্যাহত কত বিচিত্র ধরনের জীবের আবির্ভাব এ বিশ্ব চরাচরে। সাধারণ লোক এটাকে যে ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব অনুযায়ী এ'পার্থক্যের মূলে আছে পূর্ব জন্মের কৃত কর্মফল।

মৃত্যুর নামে শিউরে উঠে মন। কিন্তু এর পরেও কেউ মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়না। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বদ্ধ কঠিন এক বাস্তব সত্য।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?

চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে ?

জন্মের হাত ধরে শুধু মৃত্যু আসেনা, আসে অজস্র দুঃখের রাশি। অর্থাৎ ভরা পসরা নিয়ে হাজির হয় জন্ম। জন্ম আছে বলেই জীবকে দুঃখের ভার বইতে হয়। যেখানে জন্ম নেই সেখানে মৃত্যুর দুঃখও নেই। একটি অবস্থা যদি অন্য একটি অবস্থার উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ঐ অবস্থার নিরোধ হলে তার ফলও তিরোহিত হতে বাধ্য।

প্রতীত্য সমুৎপাদের বারটি স্তর তিন কালের সঙ্গে সংযুক্ত। অবিদ্যা ও সংস্কার এ দুটি অতীত; বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব এ' আটটি বর্তমান এবং জন্ম ও মৃত্যু এ দুটি ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে যুক্ত। এ কার্য-কারণ ধারা চলছে নদী প্রবাহের মত অনন্ত কাল ধরে, এ প্রবাহেই আবর্তিত হচ্ছে সমস্ত জীব জগৎ। প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্য-কারণের এ ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চক্রের মত ঘূর্ণায়মান বলে একে বলা হয় ভব চক্র। একমাত্র শীলের সাধনা, সমাধির ভাবনা এবং প্রজ্ঞার যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা এ কার্য-কারণ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সত্তা সমূহ অনন্তকাল ধরে আবর্তিত পুনঃ পুনঃ

জন্ম ও মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন ধারার দুঃখ পূর্ণ সংসার আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভবচক্র অবিরামভাবে বয়ে চলেছে এভাবে- অবিদ্যা → সংস্কার → বিজ্ঞান → নামরূপ → ষড়ায়তন → স্পর্শ → বেদনা → তৃষ্ণা → উপাদান → ভব → জন্ম → জরা-ব্যাধি-বার্ধক্য-মৃত্যু।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ'কথা স্পষ্ট যে, অবিদ্যা তিরোহিত হলে সংস্কারের পথ রুদ্ধ; সংস্কারের পথ রুদ্ধ হলে, বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ; বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ হলে;

নামরূপের পথ রুদ্ধ; নামরূপের পথ রুদ্ধ হলে, ষড়ায়তনের পথ রুদ্ধ; ষড়ায়তনের পথ রুদ্ধ হলে, স্পর্শের পথ রুদ্ধ; স্পর্শের পথ রুদ্ধ হলে, বেদনার পথ রুদ্ধ; বেদনার পথ রুদ্ধ হলে, তৃষ্ণার পথ রুদ্ধ, তৃষ্ণার পথ রুদ্ধ হলে, উপাদানের পথ রুদ্ধ; উপাদানের পথ রুদ্ধ হলে, ভবের পথ রুদ্ধ; ভবের পথ রুদ্ধ হলে, জন্মের পথ রুদ্ধ; জন্মের পথ রুদ্ধ হলে, জরা-ব্যাধি-বার্ধক্য এবং পরিণামে মৃত্যুর দুঃসহ যন্ত্রণার পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক

সংসার বর্তের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হউক।

রেকার্ডেল :

১। দি বুদ্ধ এন্ড হিজ টিচিংস - নারদ মহাশয়ের।

২। অভিধর্ম দর্পন - শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী।



দুঃচরিত্র ও সমাধি বিহীন হয়ে যে একশ বছর বাঁচে, তার চেয়ে চরিত্রবান, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়।

- ধর্মপদ।

যে 'অলস আর হীনবীর্য হয়ে একশ বছর বাঁচে তার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

- ধর্মপদ।

সদ্ধর্ম না জেনে যে শতবর্ষ বাঁচে, তার জীবনের চেয়ে উত্তম ধর্ম যিনি জেনেছেন তাঁর একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

- ধর্মপদ।

বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ ও তাঁদের গুণ বর্ণনা

সংগ্রহে : সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক)

সংঘ অর্থে বহুর একত্র সমাবেশ। জগতে অগণিত সংঘ বা দল আছে কিন্তু অন্তর ভিক্ষু সংঘের ন্যায় জগতে অগ্র ও শ্রেষ্ঠ কোন সংঘ নেই। তাঁরা পবিত্র ব্রহ্মচারী, সুমার্গ প্রতিপন্ন, অন্তর পুণ্যক্ষেত্র এবং বুদ্ধ শাসনের ধারক ও বাহক।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম ভিক্ষুসংঘের সৃষ্টি করেন। এই অন্তর ভিক্ষু সংঘ বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। ভিক্ষু সংঘই বুদ্ধের শাসন মার্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী। আড়াই হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে ঋষিপতন মৃগদাবে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার এবং ভিক্ষু সংঘের প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধের দেশিত সদ্ধর্মের ধারক, বাহক ও রক্ষক গৈরিক বসনধারী মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু সংঘই বুদ্ধের দেশিত সদ্ধর্মকে এ'পর্যন্ত রক্ষা করে আসছেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের মূলে একমাত্র শাসনবাহী ভিক্ষুসংঘ। বুদ্ধের ধর্মকে দেশে-বিদেশে প্রচার ও প্রসারের ভূমিকা পালনে ভিক্ষুসংঘ না হলে সেদিনই বুদ্ধের ধর্ম অন্তর্ধান হয়ে যেত। গৃহীদের পক্ষে যা' সম্ভব নয় ভিক্ষুদের পক্ষে তা একেবারে সহজ। কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে উত্তর গিরিমালা ডিঙ্গিয়ে, সাগর পেরিয়ে সংসারাসক্ত ড্রাক্ট অজ্ঞানাসক্ত মানবের কাছে তাঁরা বুদ্ধের অমৃতময় বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং কত রাজ্য সীমানা ছেড়ে অপর রাজ্যে পৌছিয়েছেন তা' ভাবলে বিশ্বয়ের সীমা থাকে না। ভগবান বুদ্ধের পরবর্তীতে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারে ভিক্ষুসংঘের অবদান অনস্বীকার্য। সর্ব প্রাণীর হিত চিন্তায় দুঃখ মুক্তির চিন্তায় তনয় ভিক্ষুসংঘ অসংখ্য অশ্রদ্ধাবান নরনারীকে শ্রদ্ধাবান, দুঃখশীলকে শীলবান, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্নকে সত্যক দৃষ্টিক, অজ্ঞানীকে জ্ঞানী, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী' নিষ্ঠুরকে দয়ালু, হিংসুককে অহিংসক, বসলকে শান্ত, শিষ্ট বিনীত করেছিলো তা' বর্ণনাভীত। ভিক্ষুসংঘ হ'তে ভগবান বুদ্ধের অমৃতময়

ধর্মোপদেশ শ্রবণে অগণিত নরনারী আত্ম পরিচয় লাভ করে জীবনে মঙ্গল দর্শন করেছেন। কত নরনারী দেব-মনুষ্য সম্পত্তি ভোগের হেতু উৎপন্ন করেছেন, অনেকে মার্গফল লাভ ও পরিশেষে পরম শান্তি নির্বাণের অধিকারী হয়েছেন তা' বলে শেষ করা যাবে না।

ভিক্ষু সংঘ নরনারীবৃন্দকে দান কথা, শীলকথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন কথা, নির্বাণ কথা, কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টি বর্জনের কথা, লোভ-দেষ-মোহ, কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুদলের ধ্বংস সাধনের কথা উপদেশ দেন। ধর্মদেশক ভিক্ষু অমৃতই দান করে। অমৃত দানকারী ভিক্ষুসংঘের কৃত উপকারের প্রত্যাশা করা দায়ক দায়িকাদের পক্ষে অসম্ভব।

ভগবান বুদ্ধ সিংহনাদে ভিক্ষু সংঘের গুণ বর্ণনা করেছেন। ভিক্ষু সংঘের জীবনধারা সংসার স্রোতের বিপরীত। মনুষ্যভূমিও ছয়টি স্বর্গলোকে প্রাণীমাত্রেরই কাম পরিভোগে রত। ব্রহ্মচার্য রক্ষা করা ও ইন্দ্রিয় দমন করা সহজ কথা নয়। একত্রিংশ ভূবনের সত্ত্বগুণ অবিদ্যারূপ অভ্যকোষে আচ্ছাদিত ও তৃষ্ণাজালে পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক জাত-প্রাণীর অনন্ত জন্মের একটা সংসার প্রবাহ বিদ্যমান যা' তাদের অন্তর জগতে উৎপন্ন হয়ে প্রাণী গণকে বিপথে পরিচালিত করে। আপাত মধুর কিন্তু পরিণামে বড়ই দুঃখ পূর্ণ, বহুকাম ও কলুষ কাম এই দুই কাম হতে সংসার বিরাগী ভিক্ষুগণ বিরত। তাঁরা সাধারণ কামভোগীর চেয়ে ইন্দ্রিয় দমনে, সংযমে, ব্রহ্মচার্য পালনে, বিনয়শীল রক্ষণে সদা সচেষ্ট। তাঁরাই জগতে শ্রেষ্ঠ ও অন্তর এবং সকলের নমস্যা ও পূজ্য।"

ভগবান বুদ্ধ আরো বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, জগতে অধিক সংখ্যক সত্ত্ব কামের প্রতি আসক্ত কিন্তু কুলপুত্রগণ

সেই হাস্য-লাস্য জনিত কাম সন্তোষ পরিত্যাগ করে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়। তাই “কুলপুত্র গণ শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত” এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। তার কারণ কি? তীরা যৌবনে যথেষ্ট কাম পরিভোগ করতে পারত। সেই ভোগ্য কাম হীন মধ্যম উত্তম যাদৃশ হোক না কেন, তা’ সমস্তই কামের মধ্যে পরিগণিত। এই কাম ত্যাগ করে তারা কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করে মুণ্ডিত মস্তক হয়ে আমার শাসনে দীক্ষা নেয়। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। তীরা কারাগার হতে পলাতক নহে, দস্যুগৃহত বধ্য ব্যক্তি নহে এবং ঋণগ্রস্থও নহে। কোন ভয়েও ভীত নয় কিংবা জীবিকা নির্বাহে অসমর্থও নহে। অপিচ “আমরা জ্ঞান-জরা-ব্যাধি-মরণ, শোক-পরিবেদন, দুঃখ-দোষনিবৃত্তি, উপায়াস প্রভৃতি দুঃখের অবসান করব” -এই সদৃশ সংকল্প নিয়েই কুলপুত্রগণ আমার শাসনে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেয়।”

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, “আমার পরিনির্বাণের পর সর্বভ্যাগী ভিক্ষুসংঘই এই নৈবাণিক শাসন রক্ষা করবে। সংঘের অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি ধর্ম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সুপতিপন্ন সংঘ গঠন করেছিলেন। মিলিঙ্গ প্রদেশে উক্ত আছে- “প্রব্রজ্যার গুণ অনন্ত-অপরিসীম। মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালায় পরিমাণ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি প্রব্রজ্যা গুণের পরিমাণ করাও অসম্ভব।

ভিক্ষুসংঘের আধ্যাত্মিক গুণ-পণা সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেছেন,- “একমাত্র নির্বাণলাভের জন্যই কুলপুত্রগণ শাসনে দীক্ষা নেন। নির্বাণ আয়ত্ত্ব করা সহজ নয় বটে কিন্তু সাধকের পক্ষে ইহা এত কঠিন নয়। যীরা অতীন্দ্রিয়ভাবে ধ্যানের অনুশীলন করেন, চঞ্চল চিত্তকে সদা সমাহিত রাখেন তীরা অল্প সময়ের মধ্যে অমৃত আনন্দ উপলব্ধি করেন।” আকাশের যেমন কোন আকার চিহ্ন নেই -এই শাসনের বাইরেও কোন নির্বাণ মার্গ নেই এবং মার্গলাভী কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণও নেই। ইহাই একমাত্র নির্বাণপামী শাসন। তাই বুদ্ধ শিষ্যগণ সর্বদা ধ্যান সাধনায় অভিরমিত হন।”

বুদ্ধ বলেছেন,- “ভিক্ষুগণ, জগতে দ্বিবিধ সুখ- আমিষ সুখ ও নিরামিষ সুখ। এতদুভয়ের মধ্যে নিরামিষ সুখই শ্রেষ্ঠতর। পঞ্চান্তরে যা’ অনিত্য, ঋণস্থায়ী, ঋণভঙ্গুর সাধারণ ভোগী মানুষ সেসব ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি কাম্যবস্তু নিয়ে সুখ অনুভব করে। ভোগী মানুষেরা যা সুখ মনে করে নির্বাণ দর্শন লাভী আর্য শ্রাবকের কাছে তা’ নিতান্ত ঘৃণার্থ ও উপেক্ষণীয়। তা’ জ্ঞানীর চক্ষে দুঃখ বহুল। সমুদ্রের লবন রসিত জলপানে যেমন তৃপ্তি নেই; তা’তে পিপাসা মিটে না তেমনি বৈষয়িক বিষয় বাসনাতে সুখ আছে বলে মনে হলেও তা’তে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। কেবল দুঃখ উৎপাদনই হয়। এই সংসারে কেউ দুঃখ কামনা করে না, সবাই সুখের প্রত্যাশী। জগতে যা শাস্ত, পরম সুখ ও চিরসুখ তা’ নিরামিষ সুখ। একমাত্র ধ্যানমার্গেই এই সুখ লাভ করা যায়। তাই বুদ্ধ শিষ্যগণ অমৃতসুখ বা নিরামিষ সুখ, আয়ত্ত্বের জন্য চঞ্চল চিত্তকে সমাহিত করেন এবং সমাহিত চিত্তেই নিষকাম বৈরাগ্য সুখের যথার্থ অধিকারী হন।”

ভিক্ষুসংঘের গুণ অগ্রমেয়। সংঘগুণ ভাবনায় সংঘের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়, শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, অন্তরের কলুষ কালিমা দূরীভূত হয়। সংঘের নয় প্রকার গুণ সমূহ নিম্নরূপঃ-

ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণের যে অদ্বিতীয় পন্থা আবিষ্কার করেছেন সেপথ অবলম্বনে অবশ্যই নির্বাণ নগরে পৌছা যায়। বুদ্ধ শিষ্যগণ সেই মার্গ প্রতিপদায় যথাঃ- সম্যক প্রতিপদা, অনিবর্ত্তি প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অনুধর্ম প্রতিপদা ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এই পঞ্চ প্রতিপদায় প্রতিপন্ন বলে ভগবানের শ্রাবকসংঘ ‘সুপতিপন্ন’।

ভগবানের শ্রাবকসংঘ উজ্জুপথ প্রতিপন্নঃ- বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী নির্বাণের অতি সহজতম পথ বেয়ে চলেন। বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করলে অতি সহজেই নির্বাণ লাভ করা যায়। বেহেতু এই মার্গে কামসুখ ও আত্ম পীড়ণ এই দুই অন্ত্য বর্জিত। নির্বাণলাভের জন্য

ইহা মধ্যম পথ। ভগবানের শ্রাবক সংঘ তাই উজ্জ্বল পথে বা সোজাপথে প্রতিপন্ন।

ভগবানের শ্রাবক সংঘ ন্যায় প্রতিপন্ন- আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের যথার্থ পথ। বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ সে-পথ অবলম্বনে নির্বাণাভিমুখে চলেছেন। তাই তাঁরা ‘ন্যায় প্রতিপন্ন’।

ভগবানের শ্রাবক সংঘ সমীচীন প্রতিপন্ন- ভগবানের শ্রাবক সংঘ সমীচীন বা উত্তম পথ বেয়ে অর্থসর রত। এই উত্তম পথেই তাঁরা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ হয়ে থাকেন। তাঁরা যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম, পূদগল হিসাবে অষ্ট পূদগল- এই কারণে বুদ্ধের শিষ্য মন্ডলী ‘সমীচীন প্রতিপন্ন’।

ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহবানীয়ঃ- ভগবানের শ্রাবক সংঘ আহতি বা চীবর, পিন্ড, শয্যাসন ও ঔষধপত্র দানরূপে গ্রহণের যোগ্য বলে ‘আহনেন্য’। দূরদেশ হতেও আমন্ত্রণ করে আহতি বা পূজা দেবার যোগ্য বলে ‘আহবানীয়’। রাজা-প্রজা, দেবরাজ ইন্দ্র সকলের আহবানের যোগ্য বলে আহবানীয়। দানফল উৎপাদনের শ্রেষ্ঠক্ষেত্র এবং পূজার যোগ্যপাত্র এবং ত্রিঙ্গতে সংঘ সমতুল্য শ্রেষ্ঠ, পবিত্র আর কেউ নেই বলে আহবানীয়।

ভগবানের শ্রাবকসংঘ পাহনেন্য- দূরদেশ হতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রের সৎকারের জন্য সজ্জিত দ্রব্য সামগ্রী পাহন বলা হয়। সেই উত্তম পাহন দানের ও গ্রহণের যোগ্যপাত্র এবং সংঘসদৃশ পাহনেন্য আর নেই। তাই তাঁদেরকে সর্বাত্মে আহতি বা পূজা দেবার যোগ্য বলে ‘পাহনেন্য’।

ভগবানের শ্রাবক সংঘ দাক্ষিণ্যে- পর বিশ্বাস করে যে দান দেয়া হয় তাকে দাক্ষিণ্য বলা হয়। সংঘ অনু-পানীয়-যান-বস্ত্র-মালা-গন্ধ-বিলেপন-শস্য-আবাস-প্রদীপ এই দশবিধ দানীয় বস্তু বা দাক্ষিণ্য গ্রহণের যোগ্য বলে ‘দাক্ষিণ্য’।

ভগবানের শ্রাবকসংঘ অঞ্জলী করণীয় সংঘের বিচরণ ক্ষেত্রে এবং যেখানে তাঁদের দর্শন মিলে তৎক্ষণাৎ তাঁদিগকে প্রসন্নচিত্তে অঞ্জলীবদ্ধ প্রণাম করার যোগ্য বলে ‘অঞ্জলী করণীয়’।

ভগবানের শ্রাবকসংঘ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উর্বর ক্ষেত্র তুল্য ভিক্ষুসংঘ জগতে অদ্বিতীয়, সেহেতু বুদ্ধের শ্রাবকসংঘ ‘জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’।

ভগবান বুদ্ধ ‘অগ্রপ্রসাদ সূত্রে’ বলেছেন,- “জগতে যত সংঘ বা দল আছে তন্মধ্যে তথাগতের শ্রাবক সংঘই অগ্র ও শ্রেষ্ঠ। যীরা এই উত্তম সংঘে প্রসন্ন তারা অগ্রেই প্রসন্ন। অগ্র প্রসন্নদের বিপাক বা ফল ও অগ্রেই হয়ে থাকে। তাদের দিব্য ও মানুষিক শ্রেষ্ঠতম আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ও প্রজ্ঞা লাভ হয়।”

কক্চুমপ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন,- “ভিক্ষুগণ, কেউ যদি তোমাদিগকে অকালে, অসময়ে হিংসাদঙ্ক অন্তরে, অসম্মত রূপে অনর্থক পরুষ বাক্যবাণে বিদ্ধ করে, তবে তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত- ‘আমাদের চিন্তা বিকৃত করব না, আমরা পাপবাক্য উচ্চারণ করব না, হিতকামী ও করুণা-পরবশ হয়ে বাস করব, চিন্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখব, অন্তরে ঘেঁষাভাব আনব না, আমরা সেই হিংসুকী পুরুষের প্রতি মৈত্রী চিন্তা বিচ্ছারিত করে বাস করব। এমনকি বিশ্ব জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি অগ্রমেয়, অপরিসীম অবৈর, ঘেঁষ রহিত, মৈত্রীভাব পোষণ করে বিহার করব।’ যদি কোন দস্যু-ডাকাত দা, ছুরি, করাত দিয়ে জীবনও নাশ করে দেয় তথাপি তার প্রতি বিদ্বেষ রহিত মৈত্রীভাব পোষণ করবে। এমতাবস্থায় যারা সেই শত্রুর প্রতি ঘেঁষাভাব অন্তরে পোষণ করবে, তারা আমার আজ্ঞাবহ শিষ্য হতে বহুদূরে। সুতরাং বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি অগ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে এবং শত্রুকে ও মৈত্রী বারি দিয়ে আপন করে নেবে।”

পঞ্চ উপাসক কাহিনী

সুনীল কুমার কারবারী

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময় শ্রেষ্ঠ দানবীর ছিলেন অনাথপিণ্ডিক। তাঁহার কর্তৃক নির্মিত “জৈতবন বিহার” —এ ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করিবার সময় একদিবস পঞ্চ উপাসক ধর্মশ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া বিহারে গমন করতঃ ভগবানকে বন্দনা পূর্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

বুদ্ধগণ সতত সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য দয়া আর করুণাসাগর। তাই তাঁহারা “ইনি ক্ষত্রিয়, ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি গরীব, ইনি ধনী, ইনি রাজা, ইহাকে অধিকভাবে ধর্মদেশনা করিব, ইহাকে করিব না” —এইরূপ ভাব উৎপন্ন করেন না। কোন বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া ধর্মদেশনা করিবার সময় আকাশ হইতে গঙ্গা অবতরণ করার ন্যায় ধর্মদেশনা করেন। ধর্মদেশনা করিবার সময় তথাগতের নিকট উপবিষ্ট উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নিদ্রালু হইল, একজন অঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খোঁচাইতে লাগিল, একজন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিল, একজন বৃক্ষ চালনা করিয়া বসিয়া রহিল আর অন্যজন মনোযোগ সহকারে ধর্মশ্রবণ করিল।

ভগবানের সেবক আনন্দ স্থবির ভগবানকে ব্যঞ্জনী করিতে করিতে পঞ্চ উপাসকের ব্যাপার দর্শন করতঃ বলিলেন,— “ভগ্নে আপনি ইহাদিগকে মহামেষ্য গর্জনের ন্যায় ধর্মদেশনা করিতেছেন, অথচ আপনি ধর্মদেশনা করিবার সময় তাহারা এইরূপ করিয়া উপবিষ্ট আছে। ইহার কারণ কি?” বুদ্ধ বলিলেন— “হে আনন্দ, তুমি তাহাদের বিষয় জান না। যেই ব্যক্তি নিদ্রালু অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে, সে পঞ্চশত জন্ম সর্প জাতিতে উৎপন্ন হইয়া দেহের উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইত। এখনও নিদ্রায় তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। তজ্জন্তু তাহার কর্ণে আমার শব্দ প্রবেশ করিতেছে না। পুনঃ আনন্দ বলিলেন— “সে কি একাক্রমে পঞ্চশতবার সর্প

জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে নাকি মধ্যে মধ্যে জন্ম নিয়াছে। “বুদ্ধ বলিলেন “আনন্দ, এই ব্যক্তি সময়ে মনুষ্য, সময়ে দেবতা এবং সময়ে সর্প এইরূপ অন্তর—অন্তর উৎপত্তির কথা সাধারণ জ্ঞানে ও পরিচ্ছেদ করিতে পারিবে না। তবে ক্রমান্বয়ে পঞ্চশত জন্ম নাগ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিদ্রাগত হইলেও নিদ্রায় তৃপ্ত হয় নাই। অঙ্গুলি দ্বারা ভূমি খোঁচাইতে থাকা উপবিষ্ট ব্যক্তি ও পঞ্চশত জন্ম কোঁচো যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এখনও সে পূর্ব সংস্কার বশে মৃত্তিকা খোঁচাইতে রত বলিয়া আমার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। বৃক্ষ চালনা করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিও পঞ্চশত বার বানর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও সে পূর্ব সংস্কার বশে বৃক্ষ নড়াচড়ায় রত থাকিয়া আমার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। আকাশ অবলোকনে রত উপবিষ্ট ব্যক্তি পঞ্চশত জন্ম নক্ষত্র গণক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেইও পূর্বাচারিত অভ্যাস বশে আকাশ অবলোকনে রত বলিয়া আমার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। আর যেই ব্যক্তি মনোযোগের সহিত ধর্মশ্রবণে রত সে ক্রমান্বয়ে পঞ্চশত জন্ম ত্রিবেদ পারঙ্গম মন্ত্রধারী ব্রাহ্মণ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এখনও মন্ত্র ধ্যানকারীর ন্যায় মনোযোগের সহিত ধর্মশ্রবণ করিতেছে।

অতঃপর আনন্দ বলিলেন— “প্রভু, আপনার ধর্মদেশনা চর্মাди ভেদ করিয়া অস্থি মজ্জায় গিয়া স্থিত হয়। কিন্তু আপনি ধর্মদেশনা করিবার সময় এই ব্যক্তিগণ কেন মনোযোগের সহিত শুনিতোছে না।” “আনন্দ, আমার ধর্ম সুশ্রবণীয় বলিয়া মনে করিতেছ?” “ভগ্নে, তাহা কি দুঃশ্রবণীয়?” “হ্যাঁ আনন্দ।” “ভগ্নে, কেন?” “আনন্দ, বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ” —এই পদ বা শব্দ সমূহ এই ব্যক্তিগণ শত সহস্র বহুকোটি কল্পেও শ্রবণ করে নাই। এই ধর্ম তাহাদের নিকট অশ্রুত। আদি অন্ত বিরহিত সংসারে ইহারা অনেক প্রকার

তিরচ্ছান কথা (আজ্ঞে বাজ্ঞে কথা) শুনিয়া আসিতেছে।
তাহারা সুরাপানাগার ও ক্রীড়া মন্ডলাদিতে নাচ-গান করিয়া
বিচরণ করিয়াছে। তাই ধর্মশ্রবণ করিতে পারে নাই।
“ভস্মে, তাহারা কেন ধর্মশ্রবণ করিতে পারে নাই?”

ভগবান বলিলেন- “আনন্দ, ত্রিবিধ অগ্নি আছে।
যেমন- কামাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি।” ইহারা ত্রিবিধ অগ্নি
ও তৃষ্ণার কারণে ধর্মশ্রবণ করিতে পারে নাই। কামরাগ্নির
ন্যায় কোন অগ্নি নাই। এই অগ্নি ছাড়িকা পর্যন্ত অবশিষ্ট না
রাখিয়া দক্ষ করে। কখনও সন্ত সূর্য্য প্রাদুর্ভাব হওয়ার কারণে
কম্ব বিনাশক অগ্নি যেমন কিছুই অবশিষ্ট না রাখিয়া জগত
দক্ষ করে, তেমনি কামরাগ্নি দক্ষ করে। তদ্বৎ
কামরাগের সমান অগ্নি, হিংসার সমান গ্রহ, মোহের সমান
জ্বাল এবং তৃষ্ণার সমান নদী নাই। এইরূপ বলিয়া বুদ্ধ
নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন-

নখি রাগ সম অগ্নি নখি দোস সম গহো
নখি মোহ সমং জ্বালং নখি তনহা সম নদীতি।

রাগ সম অগ্নি নাই, দ্বেষ সম নাই যে বন্ধন
মোহ সম জ্বাল নাই, নদী নাই তৃষ্ণার মতন।

বিশ্লেষণঃ- ‘রাগ সম-অগ্নি’ ধূমাদি কিছুই না দেখাইয়া
অভ্যন্তর হইতে উদ্ভিত হইয়া দক্ষ করে। তাই রাগের
সমান অগ্নি আর নাই। হিংসা গ্রহ সকল সময়েই
একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। তদ্বৎ হিংসার সম গ্রহ
নাই। বন্ধন, পরিবন্ধন হিসাবে মোহ সমান জ্বাল আর
নাই। “তৃষ্ণার ন্যায়” গঙ্গাদি নদী জল পূর্ণকালে ও
অপূর্ণকালে এবং শুষ্ক কালেও নদী বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু
তৃষ্ণা নদীর পূর্ণ বা অপূর্ণ কাল কিছুই নাই। তৃষ্ণার কোন
শেষ নাই। নিত্য উনভাব থাকে। সুতরাং তৃষ্ণা সম নদী
নাই।

ভগবান বুদ্ধের দেশনা শেষ হইলে মনোযোগের সহিত
ধর্মশ্রবণকারী উপাসক স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।
এই ধর্মদেশনা উপস্থিত পরিষদের পক্ষে সার্থক হইয়াছিল।



জ্ঞানী মাত্রেই দেহ জনিত ভোগ সুখকে ঘৃণা করেন।
তাহারা কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থী
হন।

- বুদ্ধবাণী।

পার্থিব সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণ বিধ্বংসী; ধর্ম সম্পদ অনন্ত
ও অক্ষয়। গৃহী নৃপতি হইয়াও ক্লিষ্ট, কিন্তু সদাচারী
সাধারণ মনুষ্যও মানসিক শান্তি সম্পন্ন।

- বুদ্ধবাণী।

নববর্ষে বনভক্তের দেশনা

সংকলনেঃ ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

আজ ১লা বৈশাখ (১৪০১ বাংলা) রোজ বৃহস্পতিবার, ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৪ ইংরেজী। স্থান রাজবন বিহার প্রাঙ্গন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বুদ্ধ পূজা সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান সম্পন্ন হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে সকাল ১০টা তিন মিনিট হতে ১০টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে শুভ নব বর্ষ উপলক্ষে একশতরত্নপূর্ণ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের কথা হল “অজ্ঞানতাকে ধ্বংস কর এবং জ্ঞান উৎপন্ন কর।” তাহলে বুদ্ধের কথা অনুযায়ী বনভক্তে তোমাদের কতটুকু জ্ঞান দিতে পারবে কতটুকু সুখ দিতে পারবে, কতটুকু সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারবে?

বুদ্ধের জ্ঞান পরম সুখ। সত্য ধর্ম উপলব্ধি করতে হলে তোমাদের পূর্ব জন্মের পুণ্য পারমী, বুদ্ধের উপদেশ পালন এবং ইহজন্মে বিপুল পরাক্রমের সাথে জ্ঞান উৎপন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি এ তিনটার মধ্যে কোন একটি অপূর্ণ থাকে তবে তোমাদের জ্ঞান ও অপূর্ণ থেকে যাবে।

তিনি বলেন- নির্বাণ লাভ করতে হয় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তাতে তোমাদের বিপুল পুণ্য সঞ্চয় হবে। সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরম সুখ অনুভব করতে পারবে। অবিদ্যাই মানুষকে দুঃখ প্রদান করে। অবিদ্যা সর্ব দুঃখের উৎপত্তির কারণ, অবিদ্যাকে সমূলে ধ্বংস করতে পারলে বিদ্যা বা বুদ্ধজ্ঞান উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ জ্ঞানে চারি আর্থ সত্য সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। এ চারি আর্থ সত্যের উপর ভিত্তি করে ভগবান বুদ্ধ ৮৪ হাজার ধর্ম সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- যে আমার শিক্ষা গ্রহণ করবে না, উপদেশ পালন করবে না, সে নিশ্চয় নরকে বা অপায়ে পতিত হবে। যে আমার শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং উপদেশ পালন করবে সে অচিরেই সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি পাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে আরো বলেন- ভগবান বুদ্ধের সময়ে শতকরা দুই তিন জন মাত্র অপায়ে পড়তো। কিন্তু বর্তমানে মাত্র শতকরা দুই তিন জন লোক স্বর্গে গমন করেছে। বাকী সব নরকে বা চার অপায়ে পতিত হচ্ছে। তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কিসের অভাবে এ অবস্থা। একমাত্র অভাব বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধের উপদেশ।

তিনি একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেন- তোমরা নিশ্চয়ই পাহাড়ের খাঁড়া জায়গা বা কামা দেখেছ। সেখানে গরু ছাগল চড়তে গেলে ইঠাং পা ফস্কে নীচে পড়ে যায়। পরিণামে গরু ছাগলের মৃত্যু ঘটে অথবা পঙ্গু হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে সেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও খেলতে যায়। তাদের অভিভাবকেরা বকাবকি করে তাদেরকে ভাড়িয়ে দেয়, অথবা লাঠির ভয় দেখিয়ে সমান জায়গায় নিয়ে যায়। ছেলে মেয়েরা সমান জায়গায় গেলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। বকা বকিরও প্রয়োজন হয় না। ঠিক সেরূপ খাঁড়া জায়গা বা কামা হল অপায়। অবোধ ছেলে মেয়েরা হলে তোমরা, প্রশস্থ জায়গা হল বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তোমাদের অভিভাবক হলেন বনভক্তে।

তিনি আরো বলেন- বনভক্তে মধ্যে মধ্যে তোমাদেরকে বকাবকি করে কি জন্যে জ্ঞান? তোমাদের সুখের জন্যে, তোমাদের উন্নতির জন্যে, তোমাদের মংগলের জন্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে বনভক্তে তোমাদের মঙ্গলের জন্য বকাবকি করেন।

তিনি আরো জ্ঞোর দিয়ে বলেন- যে আমার বকাবকি সহ্য করতে পারবেনা- সে নিশ্চয়ই উক্ত কামায় পতিত হবে। যে আমার শিক্ষা ও উপদেশ পালন করবে সে নিশ্চয়ই খোলা মাঠে অবস্থান করতে পারবে বা সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি পাবে। শিশু যখন ক্রমান্বয়ে বড় হয় তখন তাকে আর বকাবকি করতে হয় না। ঠিক সেরূপ তোমাদের যখন জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে তখন বনভন্তেরও বকাবকির প্রয়োজন হবে না। তোমরা তাড়াতাড়ি জ্ঞান-বৃদ্ধ হয়ে যাও। বুদ্ধের শিক্ষায় ও উপদেশে দেব-ব্রহ্মা হতেও উত্তম হতে পারবে। নতুবা পশু হতেও অধম হবে।

শ্রদ্ধেয় বনেভন্তে বলেন- ভগবান বুদ্ধ শুদ্ধোধন রাজাকে উপদেশ দিয়ে বলে ছিলেন- উঠ, জাগরিত হও। ঘুমিয়ে থেকোনা। আলস্য পরায়ণ হইওনা। সদ্ধর্ম আচরণ কর। কর্মই মানুষকে সুখ দেয়, কর্মই মানুষকে দুঃখ দেয়। ধর্মের অধীনে ও কর্মের অধীনে থাকিও না। সর্বদাই

অপ্রমাদের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন কর। এ উপদেশে শুদ্ধোধন রাজার ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল।

তিনি বলেন- তোমরা ধর্মের নামে অধর্ম করনা। ধর্ম পালন না করলে উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও নরকে পড়ার আশংকা থাকবে। উত্তম ধর্ম ইহলোক-পরলোক সুখ প্রদান করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপসংহারে বলেন- তোমরা ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে না পারলে দারোগা যেমন আসামীকে ধরে নির্যাতন করে ঠিক তেমন দারোগারূপী মৃত্যু অধর্মচারীকে নির্যাতন করতে করতে অপায়ে বা কামায় ফেলে দেবে। তোমরা আসামী হইওনা। নির্বাণ লাভ করতে পারলে মৃত্যু রূপী দারোগা তোমাদের ধরতে পারবেনা। সুতরাং তোমরা খাড়া জায়গায় ঘুরাফেরা করনা।

সাধু সাধু সাধু



জ্ঞান ও শ্রদ্ধার অভাবে মানুষেরা দুঃখ পাইতেছে।
বিশ্বাসেই সম্পত্তি উৎপন্ন হয়। - বনভন্তে।

শ্রদ্ধা হতে মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি
উৎপত্তি হয়। - বনভন্তে।

ইন্দ্রিয় দমন, আত্ম দমন ও চিত্ত দমনই প্রকৃত দমন।
- বনভন্তে।

ব্রহ্ম বিহার

সংকলনে- নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

তথাগত-বুদ্ধ প্রাণীকুলের সুখের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ লাভের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পন্থা বা উপায় বর্ণনা করেছেন। মানুষের মনুষ্য সুখ লাভের জন্য মনুষ্য সম্পত্তি, দেবের দেব-সম্পত্তি, ব্রহ্মের ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ করতে হয়। উক্ত সুখ সমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে উন্নত হতে উন্নততর ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ যে সুখের কোন উপদ্রব নেই তাকে অনবদ্য সুখ বলে, আর যে সুখের কোন শেষ বা বর্ণনা নেই তা 'অনাবিল সুখ' অর্থাৎ নির্বাণ সুখ যা বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এখানে অনবদ্য সুখ বা ব্রহ্ম বিহারই বর্ণনার প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো ভাবনার দ্বারাই মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে তা' সম্ভব হয়। সেগুলো হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

এ' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত সহায়ক গ্রন্থ 'বিশুদ্ধি মার্গ পরিক্রমা' ও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত হলো।

অমলিন, শুদ্ধ, শান্ত, ব্রহ্ম-সম অবস্থান বা স্থিতিকেই বলা হয় ব্রহ্ম বিহার। তা নিঃসংশয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিচরণ। তাহলে সহজ কথায় মৈত্রী হচ্ছে- জীবের প্রতি প্রেম বা ভালবাসা, করুণা হচ্ছে জীবের দয়া বা পরদুঃখে হৃদয় বিগলিত হওয়া, মুদিতা হচ্ছে অপরের সুখ সৌভাগ্যে প্রমোদিত, আহলাদিত হওয়া এবং উপেক্ষা হচ্ছে সকল জীবের প্রতি সাম্যভাব বা অনুরাগ, বিরাগহীনতা। এ চার রকমের ধ্যান চর্চাই ব্রহ্মবিহার। বলা বাহুল্য, সত্ত্বলোক বা জীবজগৎ নিয়েই এ ভাবনা চতুষ্টয়ের চর্চা হয়। এজন্য জীব বা সত্ত্বই এ'গুলোর আলম্বন বা বিষয়।

ব্রহ্মবিহারের প্রথমেই মৈত্রী। মৈত্রী মানে, মিত্রতা বা বন্ধুত্ব যাতে আছে প্রেম বা ভালবাসার স্পর্শ। কথায় বলে

প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ। কারণ, তা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে মধুর করে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে পবিত্র করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় মৈত্রী আমাদের সহজাত সংস্কার, যদিও এর প্রকাশ সবার মধ্যে সমান নয়। জীবজগতে তা প্রত্যক্ষ করে আমরা অভিভূত হই। দুঃখের বিষয়, হীন স্বার্থবুদ্ধি এ'স্ত্র সংস্কারটিকে অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে বিদ্বেষের বহিঃস্থালিয়ে দেয়। বিদ্বেষ সহজেই সংক্রমিত হয় এক অন্তর থেকে আর এক অন্তরে। সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি সংশয় ও ঘৃণায় মানুষের মধ্যে অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে এবং মানুষের বাসভূমি শ্রাপদসংকুল অরণ্যের চেয়ে অধিকতর হিংস্রভাব পূর্ণ হয়। এ হিংস্রতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে ধরণীতলকে স্নিগ্ধ শীতল করতে পারে শুধু অন্তরের মৈত্রী।

মৈত্রী ভাবনা অভ্যাস করতে হলে শীল-শুদ্ধ প্রসন্ন মন নিয়ে নির্জন শান্ত পরিবেশে আসন গ্রহণ করে আলস্য বিনোদনপূর্বক সাধনেক্ষুর প্রথমত হিংসা বা বিদ্বেষের দোষ এবং ক্ষমাশীলতা ও প্রেমের গুণ বিচার করা একান্ত কর্তব্য। কারণ এ ভাবনার লক্ষ্য ক্রোধ ও হিংসা পরিহার করে ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বেষের দোষ ও ক্ষমার মহত্ব অনুভব করে মন যখন ধীরে ধীরে দ্বেষ মুক্ত হয়, তখন ভাবনা সুস্থ করতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ ভাবনার বিষয় ব্যক্তি। কিন্তু নির্বিচারে ব্যক্তিকে বিষয় করা যায় না। এজন্য গোড়াতেই ব্যক্তিভেদ জানা দরকার। অপরিজন, অতিশয় প্রিয়জন, মধ্য ব্যক্তি এবং শত্রু -এ চার জনের কাউকে অবলম্বন করে মৈত্রী ভাবনা আরম্ভ করা উচিত নয়। কেননা, অপ্রিয়কে প্রিয় করা সহজ নয়, অতিশয় প্রিয়জনকে অনাসক্তভাবে দেখা কষ্টকর, মধ্যব্যক্তিকে প্রেমে আলিঙ্গন করা আয়াসসাধ্য এবং শত্রুকে স্মরণ করতেই ক্রোধ জাগে। মৃত ব্যক্তি ও ভিন্মলিঙ্গ নারীর পক্ষে পুরুষ

এবং পুরুষের পক্ষে নারী) কখনো ভাবনার বিষয় হয় না। মৃত ব্যক্তিকে অবলম্বন করে যেমন ভাবনায় সাফল্য হয় না, তেমনি ভিন্ন লিঙ্গের ওপর মৈত্রী চিন্তা করতেই কামনার উদয়ে সাধনা ভেঙ্গে পড়ে। তাই সর্বপ্রথমে সাধনা শুরু করতে হয় নিজেকে নিয়ে আমি সুখী হই, দুঃখহীন হই, বৈরহীন হই, ঘেবহীন হই এবং নির্বিঘ্ন জীবন যাত্রা করি। এভাবে বার বার আপনার হিতচিন্তা করতে করতে মন যখন প্রসন্ন হয়, তখন মৈত্রী ভাবনাকে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ক্রমশঃ পরের দিকে প্রসারিত করা বিধেয়। নিজের মঙ্গলের কথা ভাবতে ভাবতে মনে মনে ভাবা উচিত -আমি যেমন সুখ চাই, দুঃখকে ভয় করি, তেমনি অপর সকলেই সুখ চায়, দুঃখকে ভয় করে। এভাবে নিজের ভিতর দিয়ে পরের চিন্তা অনুভব করা আবশ্যিক। তারপর শুরু বা শুরু-স্থানীয় ব্যক্তির স্নেহ, আদর, উপকার এবং বিবিধ সদৃশ গুণ শ্রবণ করে ভাবা উচিত - আমার পূজ্যগুরু সুখী হোন, দুঃখমুক্ত হোন, নিবৈর হোন এবং নির্বিঘ্ন জীবন যাত্রা করুন। এ চিন্তায় যদিও মন প্রসন্ন, প্রেমাপ্লুত ও একাগ্র হয়ে ওঠে, তবুও মৈত্রী ভাবনাকে ব্যক্তিবিশেষের ওপর নিবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম না করলে মৈত্রী বা প্রেম পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাতে সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রতিহত হয়। মৈত্রীর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রসারিত করে নিতে হবে। এজন্য মৈত্রী চিন্তাকে শুরু থেকে প্রিয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের দিকে টেনে আনতে হবে। এদের ওপর যখন মৈত্রী চিন্তায় মন নিবিষ্ট হয়, তখন মধ্য ব্যক্তিদের প্রতি শুভচিন্তা শুরু করতে হয়। এদের প্রতি মৈত্রী চিন্তা পরিবর্তিত করার পর শত্রুদের মঙ্গল চিন্তায় রত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু এখানে মৈত্রী সাধনার গতি সহজ সাবলীল হয় না।

শত্রুর মঙ্গল চিন্তা শুরু করতে গিয়ে তার অপরাধের কথা শ্রবণে যদি ক্রোধের উদ্বেগ হয় তাহলে শত্রুর কথা না ভেবে শুরু, প্রিয়জন কিংবা মধ্য ব্যক্তিদের প্রতি মৈত্রীভাবে আদর্শ অনুধ্যান এবং ক্রোধের অপকারিতা চিন্তা করা

বিধেয়। এতে ক্রোধ অপগত হলে উত্তম, যদি না হয়, শত্রুর গুণ নিম্নোক্ত উপায়ে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে।

(১) যদি শত্রু তোমার নিজের ব্যাপারে দুঃখ জন্মায়, তুমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে তার অগোচরে স্বীয় চিন্তে দুঃখোৎপাদন করতে চাইছ কেন?

(২) যে শীল তুমি রক্ষা কর, সে শীলের মূলোচ্ছেদকারী ক্রোধকে পোষণ কর—তোমার মত মূর্খ কে আছে?

(৩) অন্য লোক নিন্দনীয় কর্ম করেছে বলে ক্রুদ্ধ হও, তুমি স্বয়ং তেমনি (নিন্দনীয় কর্ম) করতে চাইছ কেন?

(৪) ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি তার দুঃখ উৎপাদন কর আর না-ই কর, কিন্তু ক্রোধজনিত দুঃখের দ্বারা এখনি নিজে নিপীড়িত হচ্ছে।

(৫) ক্রোধাজ্ঞ শত্রুগণ যদি কুপথ অবলম্বন করে, তুমিও ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরই অনুসরণ করছ কেন?

যদি এভাবে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোধ দূর না হয়, তাহলে নিজের ওপরের অলঙ্ঘ্য কর্মনিয়মাধীনতার কথা শ্রবণ করে ভাবা উচিত -ক্রুদ্ধ হয়ে কি করব, এ ঘেব-জনিত কর্ম তো আমার নিজেরই অনর্থের হেতু হয়ে দাঁড়াবে; যা করি তার ফল ভোগ করতে হবে; ক্রোধমূলক কর্ম কখনো সুখাবহ হতে পারে না এবং আমাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। এ কর্মফল পরের ব্যাপারেও তাই- অপকর্ম করে নিষ্ফলি নেই।

কর্মফলের কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রশমিত না হলে মহাপুরুষগণের ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ বার বার শ্রবণ করতে হয়। তাতেও যদি চিন্তা ঘেবমুক্ত না হয়, তবে অনাদ্যন্ত সংসার ভ্রমণের কথা চিন্তা করা উচিত এ অনাদ্যন্ত সংসারাবর্তে এমন কোন লোক সুলভ নয় যে জন্মান্তরে আমার পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত নয় অথবা আমার কোন না কোন উপকার করেনি; অতএব, আজ শত্রু বলে যাকে ভাবছি, সেও তো

জ্ঞানান্তরে আমারই আপনজন, তার প্রতি ত্রুষ্ক হওয়া আমার পক্ষে সমীচীন নয়। এভাবে চিন্তা করেও যদি ক্রোধ দূর করা না যায়, তাহলে তার অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করে ভাবা দরকার- কার ওপর রাগ করি, সে কি কেশ, লোম, নখ, দন্ত, রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি অথবা দেহ, অনুভূতি, মন মনোবৃত্তি এভাবে নিবিষ্ট চিন্তে অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে থাকলে ক্রোধ কোথাও ঠাঁই পায় না। যার পক্ষে এ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, তার পক্ষে অপ্রিয় ব্যক্তিকে উপহার দান অথবা তার উপকার সাধনে ক্রোধ দূর করতে হয়।

শত্রুর ওপর ক্রোধ প্রশমিত হলে শত্রুর প্রতিও মৈত্রীভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। অবশ্য যিনি অজ্ঞাতশত্রু উদার-হৃদয়, তাঁর সাধনায় শত্রু কথাটি প্রযোজ্য নয়। মৈত্রীচিন্ত যখন সকলের প্রতি সমভাবে প্রবর্তিত হয়, তখন প্রেমের উদার জগতের দ্বার খুলে যায়। সেখানে প্রিয়-অপ্রিয়-মধ্যস্থের কথা দূরে থাকুক, আত্মপর ভেদ পর্যন্ত থাকে না। তাই উক্ত হয়েছে-

মৈত্রী ভাবনায় যিনি মিত্র-অমিত্র-মধ্যস্থ ও আপনার মধ্যে বিভেদ দর্শন করেন, তাঁকে মৈত্রী ভাবনায় সিদ্ধ বা নিপুণ বলা হয় না। যখন (মৈত্রী সাধক) ভিক্ষুর এ চতুর্বিধ ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং তিনি সমগ্র সদেবক জগতে

সমভাবে প্রেম বিস্তার করেন, তাঁর সাধনা ও পূর্বোক্ত ব্যক্তির সাধনায় আকাশ পাতাল তফাৎ এবং সে মহাসাধনার সীমা জ্ঞান যায় না।

বস্তুত, মৈত্রী ভাবনায় আত্মপর ভেদজ্ঞান লোপ হচ্ছে ধ্যান-নিমিত্ত লাভ ও উপচার সমাধি অবস্থা। তার অনুশীলনে আসে অর্পণা সমাধি। তাতেই পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত মৈত্রীসিদ্ধ প্রথম ধ্যানের উদয়। সে ধ্যান নিমিত্তের উত্তরোত্তর অনুশীলনে ক্রমশঃ চতুর্ক নিয়মে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যান এবং পঞ্চক নিয়মে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান আয়ত্ত হয়। এ ধ্যানস্তর সমূহের অন্যতম স্তর অবলম্বনে মৈত্রী-ধ্যানী মৈত্রীসিদ্ধ-চিন্তা সকল দিকের, সকল সত্ত্বলোকের প্রতি প্রসারিত করে বৈরশূন্য, বেদনাহীন বিপুল উদার মৈত্রীমানস নিয়ে অবস্থান করেন।

মৈত্রী ভাবনার সুফল বর্ণনায় বলা হয়েছে- মৈত্রী সাধকের শয়ন সুখসিদ্ধ, জাগরণ সুখসিদ্ধ, দুঃস্বপ্নের পীড়ন তাঁর অজ্ঞাত। তিনি মনুষ্য অমনুষ্য সকলের প্রিয়ভাজন। দেবতা তাঁকে রক্ষা করেন। অগ্নি তাঁকে দহন করে না, শত্রু তাঁকে হেদন করে না, বিষ তাঁকে অভিভূত করে না। তাঁর চিন্তা সহজে শীঘ্র সমাহিত হয়। তাঁর মুখ প্রসন্ন উজ্জ্বল। তিনি মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করেন এবং আর্যমার্গফল লাভে বঞ্চিত হলেও মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।



যাঁরা সর্বদা জাগরণশীল, দিবারাত্র অধ্যয়নরত, যাঁরা নির্বাণ লাভের প্রয়াস করেন, তাঁদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।
- ধর্মপদ ।

অভিজ্ঞা

সংকলনে- মৈত্রী প্রসাদ খীসা

অভিজ্ঞা সাধারণতঃ ছয় প্রকার। অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান যা ধ্যান সাধনা (শমথ ও বিদর্শন) ব্যতীত লাভ করা আয়াসসাধ্য। ছয় প্রকার অভিজ্ঞার মধ্যে প্রথম পাঁচটি লৌকিক। যথাঃ-

- (১) বিবিধ ঋদ্ধি,
- (২) দিব্য শ্রোত্র ধাতুজ্ঞান বা দিব্যকর্ণ,
- (৩) পরচিস্তা বিজ্ঞান জ্ঞান,
- (৪) জ্ঞাতিস্বর জ্ঞান ও
- (৫) সত্ত্বগুণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান বা দিব্য চক্ষু।

উপরোক্ত অভিজ্ঞাসমূহ লৌকিক- যা শমথ ভাবনা দ্বারা আয়ত্ত করা হয়, তাঁদেরকে পঞ্চাভিজ্ঞা এবং শেষ আশ্রবক্ষয় অভিজ্ঞাটি লোকোত্তর যা বিদর্শন ভাবনা দ্বারা আয়ত্ত করা হয়। তাই দেখা যায় যীরা সাধনমার্গের মধ্যদিয়ে উক্ত ছয় প্রকার অভিজ্ঞালাভী হয়, তাঁদেরকে ষড়্ভিজ্ঞা অর্হত বলা হয়।

তবে, এখানে পঞ্চাভিজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত বিম্বন্ধি মার্গ সারসংকলনে শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী দ্বারা বাংলা অনুবাদিত পুস্তকটি “বিম্বন্ধি মার্গ পরিক্রমায়” পঞ্চাভিজ্ঞা বা পাঁচটি অভিজ্ঞা বিষয়ে নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

যোগী রূপ ধ্যানের শেষ স্তর চতুর্থ ধ্যান আয়ত্ত করে তার উত্তরোত্তর অনুশীলনে যখন তাতে যথার্থ নৈপুণ্য অর্জন করেন, তখন তাঁর চিস্তা হয় সমাহিত, পরিশুদ্ধ, প্রভাস্বর, উপক্লেশমুক্ত, নির্মল বশানুগ, কর্মন্য, স্থির, অচঞ্চল। এ'অবস্থায় তার ফলশ্রুতিরূপে পঞ্চবিধ লৌকিক অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞান সহজলভ্য হয়। সেগুলো হচ্ছে ঋদ্ধি বা যোগ

বিভূতি, দিব্যশ্রোত্র ধাতুজ্ঞান বা দিব্যকর্ণ, চিস্তা পর্যায় জ্ঞান বা পরচিস্তা জ্ঞান, পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান বা জ্ঞাতিস্বর জ্ঞান এবং সত্ত্বগুণের চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান বা দিব্যচক্ষু। বস্তুত এগুলো হচ্ছে এক একটি অতি মানবিক শক্তি। চতুর্থ ধ্যানকে ভিত্তি করে যখন অভিজ্ঞা আয়ত্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় অভিজ্ঞাপাদক (অভিজ্ঞাভিত্তিক) ধ্যান।

এ'প্রসঙ্গে ঋদ্ধি পাদের কথা বলা আবশ্যিক। ঋদ্ধি পাদ বলতে বোঝায় ভিত্তি যা ঋদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ। তা' চার প্রকার, যথা- ছন্দ, চিস্তা, বীর্য ও মীমাংসা বা প্রজ্ঞা। এদের প্রত্যেকটি অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট।

(১) ছন্দ হচ্ছে করার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় 'কন্তুকামতা' অর্থাৎ চিকীর্ষা। একে বলা যায় ইচ্ছাশক্তি।

(২) চিস্তাকে অধিপতি করে চিন্তের যে সমাধি বা একাগ্রতা সম্পন্ন হয়, তা চিস্তা ঋদ্ধিপাদ।

(৩) বীর্য হচ্ছে মানসিক বল বা পরাক্রম।

(৪) প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞান আলম্বনের স্বরূপ উপলব্ধি বা যথাযথ জ্ঞান। আলোকপাতে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি প্রজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বস্ত হয়।

চতুর্থ ধ্যানের নিরন্তর অনুশীলনে ছন্দ, চিস্তা, বীর্য ও প্রজ্ঞান একাগ্রতা প্রসূত পরিপুষ্টি লাভে অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং অসাধারণ শক্তির বিকাশে উপায় স্বরূপ হয়। এ' চারটি ঋদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্য ক্রিয়া করে বলে এদের বলা হয় ঋদ্ধিপাদ।

ঋদ্ধি বা যোগাবিভূতির বিকাশে নিপুণ যোগী অভিজ্ঞাপাদক ধ্যানে মগ্ন হয়ে ধ্যান থেকে উঠে অধিষ্ঠান করেন -এক হয়েও বহু হই অর্থাৎ শতজনে কিংবা ততোধিক

সংখ্যা রূপান্তরিত হই। এতাদৃশ অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবে পরিণত হয়। ভিক্ষু চুল্ল পছন্দের কাহিনী এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বাধ্যায়ে অক্ষমতার জন্য তাঁর অগ্রজ ভিক্ষু কর্তৃক বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁকে সাধন প্রণালীদানে অনুগৃহীত করেন। ভগবানের অনুগ্রহধন্য চুল্লপছক অচিরেই চতুর্ভুতিসম্প্রদা সম্পন্ন শক্তিদর অর্হণ হন। তাঁর পরম সিদ্ধির পরিচয় দানের জন্য জীবকের বাসভবনে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুদের মধ্যে তাঁকে আনার ব্যবস্থা হয় শাস্তার নির্দেশে। অনুচর তাঁকে আনতে গিয়ে বিহারে বিরাট ভিক্ষু সমাবেশ দেখে হতভম্ব হয়ে ফিরে আসে। তখন শাস্তা তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন- যিনি তোমার প্রথম নজরে পড়বেন, তাঁর চীবর প্রাপ্ত ধরে বলবে 'শাস্তা আপনাকে ডাকছেন'। সে ব্যক্তি আবার বিহারে গিয়ে তাই করে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল ভিক্ষু শূন্যে মিলিয়ে যান, শুধু থাকেন চুল্লপছক। এক হয়ে বহু হবার এটি এক দৃষ্টান্ত।

এভাবে ঋদ্ধির বিকাশে যোগী অধিষ্ঠান করে চোখের পলকে দৃশ্য ও অদৃশ্য হন, দেয়ালের ভিতর দিয়ে, প্রাচীরের ভিতর দিয়ে অথবা পর্বত ভেদ করে যাতায়াত করেন। এ'ক্ষেত্রে তাঁকে আকাশকৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে উঠে অধিষ্ঠান করতে হয় দেয়াল, প্রাচীর কিংবা পর্বতের এ'অংশ আকাশ বা শূন্য হোক। সঙ্গে সঙ্গে সেন্তুলোর নির্দিষ্ট অংশ তাঁর কাছে শূন্যে পরিণত হয়। তিনি তার ভিতর দিয়ে ইচ্ছামত যাতায়াত করেন। তিনি যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করে পুনরুন্মিত হতে চান, তখন তিনি অপকৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে সে ধ্যান থেকে উঠে অধিষ্ঠান করেন-এ'ভূভাগ জলে পরিণত হোক। সঙ্গে সঙ্গে সে-ভূভাগ তাঁর কাছে জলাশয় হয়ে যায়। তিনি সেখানে ডুব দিয়ে ওঠেন। তিনি যখন জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে চান, তখন তিনি পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে ধ্যান থেকে উঠে অধিষ্ঠান করেন- জলের এ অংশ মাটি হোক। সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁর কাছে শক্ত মাটিতে পরিণত হয়। তিনি

তার ওপর দিয়ে হাঁটা চলা করেন। যখন তিনি আকাশে অনন্ত শূন্যে পদ্মাসনে বসতে চান কিংবা শুভে চান কিংবা চলতে চান, তখন তিনি পৃথিবী কৃৎস্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে ধ্যান থেকে উঠে অধিষ্ঠান করেন আকাশের এ'অংশ কঠিন ভূমি হোক। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সে-নির্দিষ্ট অংশ তাঁর কাছে কঠিন ভূমি হয়ে ওঠে। তিনি সেখানে ইচ্ছানুরূপ বসা, শোয়া কিংবা চলাফেরা করেন।

ঋদ্ধি বলে দূর নিকট হয় এবং নিকট ও দূর হয়, অল্প বেশী হয় এবং বেশীও অল্প হয়। বলা বাহুল্য, আরও নানাভাবে শক্তির লীলাভিনয় চলে। সিংহলে দূর অতীতে দুর্ভিক্ষের সময় 'কোথায় ভিক্ষা মিলবে' বলে চিন্তাগ্রস্ত সাতাশ ভিক্ষুদের আশ্বাস দিয়ে 'চুল সমুদ্র স্ববির' তাঁর অনুসরণ করতে বলেন। তাঁদের নিয়ে তিনি যেখানে আসেন, সে স্থান তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন- কোথায় আমাদের নিয়ে এলেন? উত্তরে তিনি বলেন- বন্ধুগণ প্রবীনরা দূরকে নিকট করতে জানেন, এ'হচ্ছে পাটলিপুত্র। ঋদ্ধি বলে এ'ভাবে দূর নিকট হয়। এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ঋদ্ধিমানের হাতের নাগালে। নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমাল প্রাণপন বেগে ছুটেও ধীর মছুরগামী বুদ্ধকে ধরতে সক্ষম হয়নি। এ'নিকটকে দূর করার দৃষ্টান্ত। বহুকে অল্পে পরিণত করার ব্যাপারে রাজগৃহে কুমারীদের পিষ্টকদানের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। রাজগৃহে নক্ষত্রোৎসবের ক্রীড়ামোদরতা কুমারীরা ভগবানকে অগ্রাহ্য করে তাঁর অনুগামী শ্রাবক আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে পিষ্টকদানের জন্য এগিয়ে এলে তিনি তাদের প্রদত্ত পিষ্টকরাশি তাঁর অবহুৎ পায়ে গ্রহণ করে ভগবানের হাতে তুলে দেন। তেমনি আর এক সময়ে তিনি এক দীনতম দাতার প্রদত্ত সামান্য যাশু দিয়ে বিরাট ভিক্ষুসংঘকে আপ্যায়িত করেন। বহুকে অল্প এবং অল্পকে বহু করার এ'রকম উদাহরণ ঋদ্ধিমানদের পক্ষে বিরল নয়।

প্রজ্ঞেন্দ্রিয়

সংকলনে- নির্মল কান্তি চাক্‌মা

৫২ প্রকার চৈতসিকের মধ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক অন্যতম। কিন্তু 'বিশুদ্ধি মার্গ পরিক্রমায়' পরিলক্ষিত হয় যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্বাবিংশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উনিশ নং ইন্দ্রিয়। তবে এখানে বলিয়া রাখা বাঞ্ছনীয় যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় হিসাবে ব্যাখ্যা না করিয়া চৈতসিক হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।

প্রজ্ঞা মোহ মোচনে চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে বলিয়া ইন্দ্রিয় হিসাবে কথিত হয়। কিন্তু চৈতসিক মনের সংযোগে বিভিন্ন সংস্কার সৃষ্টি করে বলিয়া প্রজ্ঞাকে চৈতসিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই দেখা যায় প্রজ্ঞা একদিকে যেমন চৈতসিক, তেমনি অপরদিকে ইন্দ্রিয় হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কাজেই অভিধম্মার্থ সংগ্রহে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞানন (পারমার্থিকভাবে জ্ঞানন) ইহার লক্ষণ। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্ঘাটিত করিবার উপযুক্ত উপযোগী শক্তি ধারণ করে, তখন ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। অধিপতি অর্থে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞা মোহেরই (মোহ- যাহা দ্বারা সত্ত্বগুণ মুহ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মোহ বা অজ্ঞানতা) প্রতিপক্ষ। 'সংজ্ঞা', 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞা'-জ্ঞা ধাতু নিম্পন্ন শব্দ। শুধু উপসর্গ যোগে আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নত স্তরের নামকরণ হইয়াছে মাত্র। 'সংজ্ঞা'-কোন আলম্বন চক্ষাদি ইন্দ্রিয় পথে যেইরূপ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানই সেই আলম্বন সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

'বিজ্ঞান'- আলম্বনের অনিত্য লক্ষণও ভেদ করিতে পারে। কিন্তু লোকান্তর মার্গ পাইতে পারে না। প্রজ্ঞা কিন্তু

সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের কার্য্যসহ লোকান্তর মার্গ জ্ঞানের অধিকারী। এই প্রজ্ঞা- অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যকদৃষ্টি, বোধ্যঙ্গ, ধর্ম-বিচার; কুশল-মূলে 'অমোহ', ভাবনা কর্মে 'সম্প্রজ্ঞান' সমাধিতে 'বিদর্শন', ঋদ্ধিপাদে 'মীমাংসা', প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্মে অবিদ্যার প্রতিপক্ষ 'বিদ্যা'।

'প্রজ্ঞা' আলম্বনের যথার্থ স্বভাব ও অযথার্থ স্বভাব ভেদ করে। 'স্মৃতি' সেই অযথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ স্বভাব গ্রহণ ও রক্ষা করে। 'প্রজ্ঞা' বিষয়টি প্রকাশিত করে; 'স্মৃতি' ঐ প্রকাশিত বিষয়টিকে দৌবারিকের ন্যায় পাহারা দেয় এবং স্তম্ভের ন্যায় উহাতে প্রোথিত থাকে। 'প্রজ্ঞা' বলে- "কেশাদি অশ্চি", স্মৃতি বলে তাইত। অশ্চিইত"। এবং এই জ্ঞানে চিন্তকে নিমজ্জিত রাখে, মোহকে আসিতে দেয় না। 'শুদ্ধা' চিন্তকে বুদ্ধোপদেশের প্রতি নমিত করে। প্রজ্ঞা চিন্তকে নির্বাণ-পথ উদ্ভাসিত করিয়া প্রদর্শন করে। 'স্মৃতি' চিন্তকে পথ ভ্রংশ হইতে রক্ষা করে ও অগ্রসর করায়; 'একাগ্রতা' চিন্তকে সেই একই লক্ষ্যে নিবিষ্ট রাখে। 'বীৰ্য্য' কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে।

অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কুশলের মূল। "অথসালিনীতে" আচার্য্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন- অলোভ মাৎসর্য্য-মলের, অদ্বেষ দুঃশীলতার এবং অমোহ কুশল-চিন্ত অননুশীলনের প্রতিপক্ষ। অলোভ দানের হেতু, অদ্বেষ শীলের হেতু, অমোহ ভাবনার হেতু। অলোভের দ্বারা অনধিক গ্রহণ, অদ্বেষ দ্বারা পক্ষপাত বর্জন এবং অমোহ দ্বারা অবিপরীত দর্শন হইয়া থাকে। অলোভ বিদ্যমান দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করে অদ্বেষ বিদ্যমান গুণকে গুণ বলিয়া প্রচার করে, অমোহ যথাযথ স্বভাবকে

যথাযথভাবে বুঝে, গ্রহণ করে ও ব্যক্ত করে। অলোভের প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, অদ্বৈতের অপ্রিয় সমাগম দুঃখ, অমোহের ইচ্ছা-বিঘাত দুঃখ জন্মে না। অলোভের জন্ম দুঃখ, অদ্বৈতের জন্ম দুঃখ এবং অমোহের মরণ-দুঃখ অনুভূত হয় না। অলোভ গৃহস্থ জীবনকে, অমোহ প্রব্রজিত জীবনকে এবং অদ্বৈত উভয় জীবনকে সুখময় করে। বিশেষতঃ অলোভ প্রেত-লোকে, অদ্বৈত নিরয়-লোকে এবং অমোহ তির্য্যক-যোনিতে উৎপত্তি বারণ করে। অলোভ আসঙ্কলিঙ্গায়, অদ্বৈত ভেদ চেষ্টায় এবং অমোহ অজ্ঞানজ উপেক্ষায় বাধা প্রদান

করে। এই চৈতিকত্রয় যথাক্রমে নৈষ্কাম্য জ্ঞান, অব্যাপাদ-জ্ঞান ও অবিহিংসা-জ্ঞান। আরও বলিতে গেলে ক্রমে “অশুচি জ্ঞান”, ‘অগ্রমেয় জ্ঞান’ ও ‘ধাতু’ (যথা-স্বভাব) জ্ঞান। অলোভ কাম-সুখ বর্জন, অদ্বৈত কৃষ্ণ-সাধন-বর্জন, অমোহ মধ্য-পথানুসরণ। অলোভ স্বর্গলোকের, অদ্বৈত ব্রহ্ম-লোকের এবং অমোহ আর্য্য জীবনের প্রত্যয়। অলোভ অনিত্য জ্ঞানের সহিত, অদ্বৈত দুঃখ জ্ঞানের সহিত এবং অমোহ অনাত্ম জ্ঞানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।



অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ কর, প্রাণ নাশ করিও না- ইহাই
সত্যধর্ম। - বুদ্ধবাণী।

লোকে অন্যকে যেমন সংযত হবার উপদেশ দেয় এবং
নিজেকে যদি সেভাবে গঠিত করে, তবে নিজে সংযত
হয়ে অপরকেও সংযত করতে পারবে। নিজেকে দমন
করানি অতিশয় কঠিন। - ধর্মপদ।

সৎপুরুষ দর্শন, সদ্ধর্ম শ্রবণ, প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা ও সদ্ধর্ম
আচরণই ইহ জন্মে প্রশংসিত হয়। - বনভঙ্তে।

সকল বস্তুতে দুঃখ, মিথ্যা ও পাপ দেখে আসক্তি বর্জন
কর। - বনভঙ্তে।

চিকিৎসকের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও ধর্ম

ডাঃ নিহারেন্দ্র তালুকদার

“বুদ্ধগুণং অনন্তরহি আকাশ বিপুল সমং

ক্ষপয়েৎ কল্প নচ বুদ্ধ গুণ ক্ষীয়ঃ”

অর্থাৎ বুদ্ধগুণ অনন্ত। বুদ্ধগুণ আলোচনা করতে গেলে কল্প শেষ হয়ে যাবে তবুও বুদ্ধগুণ বর্ণনা শেষ হবে না।

তাই আমার মতো একজন চিকিৎসকের দৃষ্টিতে বুদ্ধের গুণ নিরূপণ ও আলোচনা করা মূঢ়তার নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়। তবুও আমার দৃষ্টিতে বুদ্ধও তাঁর ধর্মকে কি হিসেবে দেখেছি তা' আমি যৎ কিঞ্চিৎ উপস্থাপন করবো। এ'ব্যাপারে যদি আমার কোন ভুল ভ্রটি হয়ে থাকে আমি সুধীজনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ইহাও বলে রাখা ভাল যে চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যাপারে আমি সারাজীবন যতটুকু জ্ঞানার্জনের সাধনা করেছি, ঠিক তৎপরিমাণ বুদ্ধ দর্শন চর্চা করার সুযোগ হয়নি। তবে উক্ত বিষয় হতে খুব দূরে সরে থাকিনি। বুদ্ধ দর্শন গবেষণা করে আমি যতটুকু জানলাম, ইহা অত্যন্ত জ্ঞান গভীর, যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, ভাবাবেগ বিহীন এবং স্বয়ং দর্শনীয়। তথাগত বুদ্ধ সমস্ত প্রাণীকুলের দুঃখ মুক্তির জন্য যেভাবে সুদীর্ঘকাল ধ্যান সাধনা করে তার কারণ ও সমাধান খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক তেমনি চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রেও অতি প্রাচীন কাল হতে রোগের কারণ ও রোগমুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন।

মানুষ অবিদ্যা-তৃষ্ণার কারণে যেমনি এ'ভবচক্রে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দুঃখ ভোগ করতেছে, তেমনি সাধারণ মানুষ নিজ অজ্ঞানতার ও সচেতনতার কারণে বিভিন্ন রোগে রোগাণ্ড হয়ে পুনঃ পুনঃ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

তথাগত বুদ্ধ তাঁর কার্যকারণ প্রবাহ বা প্রতীভা সমুৎপাদ নীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে সুধীজন জ্ঞানতে পারলো কেন এই প্রাণীকুল পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও বিলয় হচ্ছে। এই উৎপত্তি ও বিলয়ের মধ্যে রয়েছে অনন্ত দুঃখ যা' তথাগত বুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন ধর্মগুরু সৃষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ইহাকে এক কথায় ভবচক্রও বলা হয়।

এই ভবচক্র হতে মুক্তির জন্য বুদ্ধ মধ্যম পথ বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করেছিলেন। ইহার পর অসংখ্য কোটি দেব মনুষ্য যেমন চিরমুক্তি বা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন, ঠিক তেমনি বহুপ্রাণী মনুষ্য সুখ, দেবত্ব সুখ, ব্রহ্মত্ব সুখ, মার্গ ও ফল সুখ লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, আরো অনেক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কুপথগামী, অপায়গামী অধর্মচারীরা ও সুগতি লাভ করেছিলেন। এমনকি দুর্গতিভূমির প্রাণীরা পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিলেন।

ঠিক তেমনি চিকিৎসা শাস্ত্রও বহু রোগের কারণ ও রোগমুক্তির ঔষধ আবিষ্কার করে বহু রোগ হতে পরিত্রাণ পেয়েছেন এবং পাবেন।

বুদ্ধ যেমন চারি আর্য সত্যের মধ্যে বলেছেন দুঃখ কি, দুঃখ সমুদয় কি, দুঃখ নিরোধ কি এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বা কি আবিষ্কার করেছেন, ঠিক তেমনি চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায় রোগ কি, রোগের কারণ কি, রোগের নিরোধ কি এবং রোগ নিরোধের উপায় বা কি-ঠিক এ'ভাবে রোগীকে চিকিৎসকগণ প্রথমে রোগ কি নির্ণয় করেন, ইহার কারণ কি, ইহা কি করে নিরোধ করা যায় এবং কিসের দ্বারা রোগমুক্ত করা যায়। বুদ্ধের উক্ত সূত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় এমন কোন পার্থক্য নেই বরং বুদ্ধের সেই চারি আর্যসত্য সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসা করলে- রোগ নির্ণয় হতে রোগারোগ্য পর্যন্ত একই সূত্রে এর সূষ্ঠ সমাধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে এটুকু বলে এ'প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি টানছি যে- তথাগত ভগবান বুদ্ধ সর্ব প্রাণীর ভবরোগ আরোগ্যের জন্য চির দুঃখ মুক্তির চিকিৎসা করেছিলেন কিন্তু একজন চিকিৎসক কোন রোগীকে সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভে সমর্থ হলেও চির দুঃখ মুক্তির জন্য আরোগ্য লাভ করাতে পারেন না। তাই একমাত্র তথাগতের আবিষ্কৃত ভব রোগ দুঃখ মুক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের পরমার্থ জ্ঞান উদয় হলে সর্ব দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করা যায়।

অনুশয়

সংকলনে-প্রশান্ত কুমার দেওয়ান

(‘অভিধর্মার্থ সঙ্গ্রহ’ পুস্তক হইতে সংগৃহীত)

কতগুলি চৈতসিক এমন বিশিষ্ট স্বভাব সম্পন্ন যে, তাহারা চিন্তা-সত্ত্বতিতে প্রচ্ছন্ন থাকে, সুপ্ত থাকে; কিন্তু আলম্বনাদি অনুরূপ কারণ পাইলেই জাগিয়া উঠে। ইহারা অতীব শক্তিশালী এবং ইহাদিগকে অনাগত চিন্তা ক্রেশ বলা যাইতে পারে। কালভেদে চৈতসিকের স্বভাব তারতম্য হয় না। এই সুপ্ত অনুশয় ছয়টি অকুশল চৈতসিক মাত্র। কাম রাগানুশয় ও ভব-রাগানুশয় উভয়ই লোভ চৈতসিক। শুধু আলম্বনের পার্থক্য হেতু দ্বিবিধ হইয়াছে।

“কাম-রাগানুশয়” সুখ-সৌমনস্য বেদনায় ও উপেক্ষা বেদনায় এবং ‘প্রতিঘানুশয়’ দুঃখ দৌর্মনস্য বেদনায় প্রচ্ছন্ন থাকে। ‘মানানুশয়’ কাম, রূপ ও অরূপ লোকের সুখ-সৌমনস্য উপেক্ষা বেদনায় ও সুপ্ত থাকে। ‘দৃষ্টি অনুশয়’ সংকার দৃষ্টিযুক্ত যাবতীয় চিন্তে এবং ‘বিচিকিৎসা অনুশয়’ অধিমোক্ষ বিরহিত চিন্তে প্রচ্ছন্ন থাকে। ভব রাগানুশয় রূপ-অরূপ চিন্তেও সুপ্ত থাকে। “অবিদ্যানুশয়” অরহতের ফল চিন্তা ব্যতীত সর্বচিন্তে প্রচ্ছন্ন থাকে। স্রোতাপন্ন ও

সকৃদাগামীর নিকট দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা অনুশয় দুইটি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচ অনুশয় বিদ্যমান অনাগামীর নিকট মান, ভবরাগ, ও অবিদ্যা অনুশয়াকারে বিদ্যমান। শুধু অর্হতের চিন্তাই নিরনুশয়।

যাহার নিকট কামরাগানুশয় বিদ্যমান, তাহার নিকট প্রতিঘানুশয় ও বিদ্যমান এবং প্রতিঘানুশয়ের বিদ্যমানতা কামরাগানুশয়ের বিদ্যমানতা জ্ঞাপক। কামরাগানুশয়ের বিদ্যমানতা মানানুশয়ের বিদ্যমানতা জ্ঞাপক নহে। অনাগামীর নিকট মানানুশয় বিদ্যমান থাকিলেও কামরাগানুশয় বিদ্যমান থাকে না। পৃথগজ্ঞান, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীর নিকট কামরাগ ও মান উভয় অনুশয় বিদ্যমান। কামরাগানুশয় বিদ্যমান থাকিলেও, দৃষ্টি অনুশয় বিদ্যমান না থাকিতেও পারে। পৃথগ জ্ঞানের নিকট এই উভয় অনুশয় বিদ্যমান থাকিলেও স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীর নিকট দৃষ্টি-অনুশয় অবিদ্যমান, কামরাগানুশয় সম্পূর্ণ অবিদ্যমান নহে।

“সকল প্রাণী সুখী হউক।

সকল প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্তহউক।।”



যিনি নিজের অথবা অপরের জন্য পুত্র, ধন বা রাজ্য কামনা করেন না, যিনি অধর্মের পথে নিজের সমৃদ্ধিও চান না, তিনিই শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক।

- ধর্মপদ।

ধ্যান চিন্তের বিশ্লেষণ

সজ্জিত কুমার চাকমা

চিন্তা স্বভাবতঃ নির্মল, স্থির, অচঞ্চল ও ভাস্বর। আলম্বন ব্যতীত ইহা উৎপন্ন হয় না। তবে দেখা যায় চিন্তা এবং চৈতন্যিক উভয়ের সংমিশ্রণে বা আলম্বন গ্রহণে চিন্তা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। চিন্তা যেই চৈতন্যিক গ্রহণ করে ঠিক সেই স্বভাবে পরিচালিত হয়। তাই অভিধর্মার্থ সংগ্রহে দেখা যায় যে বায়ান্ন প্রকার চৈতন্যিকের মধ্যে পঞ্চাশটি সংস্কার স্বল্পে অন্তর্ভুক্ত। চিন্তা এমন কতগুলো চৈতন্যিক গ্রহণ করলে চিন্তা ধ্যানাদিমুখী হয় বা ধ্যানে নিমজ্জিত রাখে, সেগুলোকে ধ্যান চিন্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই ধ্যান চিন্তাগুলো নিম্নরূপঃ (১) বিতর্ক, (২) বিচার, (৩) প্রীতি, (৪) সুখ ও (৫) একাগ্রতা।

যদি চিন্তা পর্যায়ক্রমে উক্ত চৈতন্যিকগুলো গ্রহণ করে, তখন চিন্তা ধ্যানে নিমজ্জিত হয় বলে কথিত হয়। এ'জন্য এগুলোকে ধ্যানাঙ্গ বা ধ্যান চিন্তা ও বলা হয়। চিন্তা এ'ভাবে ধ্যানাঙ্গগুলো গ্রহণ করে প্রথম ধ্যান হতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত উন্নীত হয়।

এ'ধ্যানাঙ্গগুলো যথাক্রমে পঞ্চানীবরণ বা মানসিক প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। যেমন,

(১) স্থান মিল্লকে (কায় ও চিন্তার অবসাদকে) বিভাঙিত করে বিতর্ক- যার স্বভাব পুনঃ পুনঃ আলম্বন ও মনন। বিতর্কের কাজ হলো চিন্তাকে আলম্বনের দিকে আকর্ষণ করে রাখা।

(২) বিচিকিৎসা বা সংশয়কে বিদূরীত করে 'বিচার'। বিতর্ক দ্বারা চিন্তা যেই আলম্বন গ্রহণ করে, সেই আলম্বনে স্বভাব জ্ঞানবার জন্য বিচার তাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন করে। অনুমজ্জন বিচারের স্বভাব। এ'ভাবে নিমজ্জন-হেতু বিচিকিৎসার দ্বারা দোলায়িত হতে পারে না।

(৩) প্রীতি যখন চিন্তাকে উৎফুল্ল করে তখন সেখানে ঠাই পায় না বিদ্বেষ বা ব্যাপাদ। অর্থাৎ ধ্যানাঙ্গে সংশয় না

থাকলে সেখানে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি প্রফুল্ল স্বভাবসম্পন্ন হয়ে চিন্তাকে বিস্তৃত করে। তাই প্রীতি ঘেষের বা ব্যাপাদের প্রতিপক্ষ।

(৪) ধ্যানাঙ্গ প্রীতির নিত্য সহচার হলো সুখ, যেখানে প্রীতি সেখানে সুখ। কিন্তু যেখানে সুখ সেক্ষেত্রে নিত্য প্রীতি নাও থাকতে পারে। প্রীতি সংস্কার স্বল্প আর সুখ বেদনা স্বল্প। সুখ শারীরিক ও মানসিক দুঃখকে দূরীভূত করে কিংবা ধ্বংস করে। সুখের প্রতিপক্ষ হলো ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য। ফলে সুখ প্রতিষ্ঠিত হলে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দূরীভূত হয়।

(৫) একটি মাত্র আলম্বনে চিন্তার নিশ্চল অবস্থাই একাগ্রতা, যার দ্বারা কামছন্দ (কামনা ও কুবৃত্তি বা অকুশল মনোবৃত্তি) সম্পূর্ণ দূর হয়।

এক কথায় চিন্তাকে এ'রূপে বিতর্ক ধ্যেয় বিষয়ে আরোহন করায়, বিচার নিমজ্জিত করে রাখে, প্রীতি স্কুরিত করে, সুখ সংগঠন করে এবং একাগ্রতা নিবন্ধ করে রাখে।

আরো সংক্ষেপে বলা যায়ঃ-

- (১) স্থান মিল্লের অপগমণে - বিতর্ক,
- (২) বিচিকিৎসা অপগমণে - বিচার,
- (৩) ব্যাপাদের অপগমণে - প্রীতি,
- (৪) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অপগমণে - সুখ ও
- (৫) কামছন্দের অপগমণে - একাগ্রতা অর্জন করা যায়।

প্রথম ধ্যান হলো আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। তাই উন্নতকামী উর্ধ্বাশী যোগীকে বহুদূর অগ্রসর হতে হয়। তারা প্রথম ধ্যান আয়ত্ত করে ক্ষান্ত হন না, এবং এ'ভাবে ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা ধ্যানের স্তরে উন্নীত হন। ইহার পরও যোগীদের পাঁচ প্রকার বশিতা বা দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- (১) অনুচিন্তন বশিতা - ধ্যানগুলোর অনুচিন্তন নৈপুণ্য,
- (২) প্রত্যবেক্ষণ বশিতা - পর্যালোচনে নৈপুণ্য প্রত্যবেক্ষণ,
- (৩) অধিষ্ঠান বশিতা - পূর্ব থেকে ধ্যানকাল নির্ধারণের ক্ষমতা,
- (৪) ধ্যান বশিতা - ইচ্ছানুসারে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার ক্ষমতা ও
- (৫) উত্থান বশিতা - নির্ধারিত সময়ে ধ্যানে ভঙ্গের সামর্থ্য।

উক্ত পাঁচ প্রকার বশিতা অর্জনের অভাবে যোগীরা বুদ্ধ আবির্ভাবের সময় ধ্যান হতে যথাসময়ে উঠতে পারে না এবং তাঁদের বুদ্ধ দর্শন লাভ হয় না। ফলশ্রুতিতে তাঁদের মুক্তি মার্গ দর্শন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ- বুদ্ধ দর্শন মতে, প্রত্যেক ধ্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আস্রব-ক্ষয় করা বা নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, যদিও ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে পঞ্চাভিজ্ঞ বা অষ্টসমাপত্তি ধ্যান পর্যন্ত লাভ করা যায়। কারণ- উক্ত বিষয়গুলো- “অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম” বলে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন।

তাই পাঁচ প্রকার বশিতা অর্জনে যোগী তৎপর হয়ে ওঠেন। এ’বশিতাগুলো অর্জনের পর যোগী ধ্যানাঙ্গগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করেন। যোগী প্রথম ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়ার পর তাঁর ফলশ্রুতিরূপে বিতর্ক ও বিচার এ’ধ্যানাঙ্গ দ্বয়ের উপশমে বা নিবৃত্তিতে আস্তর প্রসন্নতায়ুক্ত একাধ বিতর্ক-বিচার বিরহিত সমাধিপ্রসূত শ্রীতি সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানে অধিগত হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় ধ্যানের পর যোগী তৃতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ করেন। কারণ দ্বিতীয় ধ্যান হতে তৃতীয় ধ্যান অধিক সুস্বতর ও শান্ততর- যেখানে শ্রীতি উৎপন্ন হয়। তবে

যেখানে শ্রীতি সেখানে সুখ, কিন্তু যেখানে সুখ সেখানে শ্রীতি নাও থাকতে পারে। শ্রীতি উৎপন্ন হওয়ার পর হতে যোগী শ্রীতির প্রতি বিরাগে বিরক্তিতে উদাসীন হন এবং শ্রুতিমান ও সম্ভ্রানে সুখ অনুভব করেন। তৃতীয় ধ্যানে উন্নীত হওয়ার পর উদ্যামশীল মুক্তিকামী যোগী যথাযথ নিয়মে তাতে নৈপুণ্য অর্জন করেন। ধ্যানাঙ্গ পর্যালোচনায় তিনি যখন চৈতসিক সুখকে চিন্তে উপভোগ বলে অবহিত হন তখন সুখে দোষ দর্শন করেন। তখন সুখ তাঁর কাছে স্থূল প্রতিভাত হয় এবং অপর ধ্যানাঙ্গ উপেক্ষা বা অনুভূতির সাম্যতা সুস্ব ও শান্ততর বলে মনে হয়, সুখের স্থূলতা পরিহার পূর্বক ধ্যানকে শান্ততর, সুস্বতর করার জন্য তিনি সেই “কৃৎস্ন ধ্যানালম্বন” আলম্বনে আবার ধ্যান মগ্ন হন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর আয়ত্ত হয় চতুর্থ ধ্যান। এ’চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, শ্রীতি ও সুখ বিরহিত হয়ে উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ধ্যানাঙ্গ হয়ে যোগীর কাছে সুস্বতর ও শান্ততর হয়। চতুর্থ ধ্যান যেখানে শারীরিক সুখ-দুঃখ ত্যক্ত, মানসিক সুখ-দুঃখ অন্তর্মিত, সুখ-দুঃখ শূন্য উপেক্ষা বা সমানুভূতিজনিত শ্রুতি সুপরিশুদ্ধ। এ’ধ্যানে শ্রুতির পরিশুদ্ধি উপেক্ষা বা সমানুভূতি দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে একে উপেক্ষা শ্রুতি পরিশুদ্ধি বলা হয়। এ’চার ধ্যানাঙ্গকে ধ্যান চতুষ্ক বলা হয়। তাই চতুর্থ ধ্যান লাভের পর যোগী অরূপ ধ্যান-স্তরে উন্নীত হন এবং পরমার্থ জ্ঞান লাভের অধিকারী হন।।

এ’ধ্যান চিন্তের মাধ্যমে মানুষের ভোগ-স্পৃহা হয় ত্যক্ত, চঞ্চল-ইত্যন্ততঃ বিচরণশীল উৎক্লিষ্ট অসংযত মন হয়ে ওঠে শান্ত এবং যাবতীয় ক্লেশ হয় প্রশমিত এবং ইহা ক্রমান্বয়ে সমস্ত ক্লেশ ধ্বংস করে লোকোত্তর সুখের অধিকারী করায়।

“সকল প্রাণী সুখী হোক।

সকল প্রাণী দুঃখ থেকে মুক্ত হোক।।”

সহায়ক গ্রন্থ :

- (১) বৌদ্ধ যোগ-সাধনা - শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির,
- (২) বিমুক্তি মার্গ পরিক্রমা - শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী,
- (৩) বিদর্শন ভাবনা - শ্রী প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া,
- (৪) অভিধর্মার্থ সম্বাদ - শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুন্দি।

রাজবন বিহার, রাজবন

অমলেন্দু বিকাশ চাকমা

কি অভিনব শোভা,
আহা, কিবা মনোলোভা
রাজবন বিহার!
ঘনবন ছায়া ঘেরা,
সবুজ বনানী মনোহরা,
শোভিছে বিহার মন্দির
মনোরম-সুষমা মন্ডিভ!
পার্বত্য চট্টলার গর্ব, অহঙ্কার!
সারা দিনমান কত শত জন
ধর্মপ্রাণ নরনারী করে আগমণ
হেরি এ'রাজবন লভে আনন্দ অপার!

সাধনানন্দ বনভাস্ত্রে তব সাধনার তরে
রাজবন বিহার উঠেছে গড়ে।
সঙ্কর্মদেশনা করি শত শত জনে
ধর্মচক্ষু খুলে দিলে অতীব যতনে।
তুমি মহান শ্রদ্ধার অলঙ্কার!

নিজে গড়া ফলফুলে সমৃদ্ধ বনভূমি
বিহার নির্মাণ তরে করেছ দান
হে মহীয়ান চাকমা রাজন তুমি
তাই রাজবন বিহার তব স্মৃতি ধরে
বৌদ্ধ জগতে তব নাম রবে অনির্বান।

গন্ধকুটি, বেনুবন, জেতবন সম
রাজবন বিহার যেন হয় অনুপম,
ত্রিপুরা নাম স্মরি
জানাই আকুল প্রার্থনা।

বেলা যখন বাড়ল

শ্যামল তালুকদার

অনেক ভেতর থেকে কে যেন বললেঃ
-দরোজা জানালা সব বন্ধ করে দাও।
সেই কবে থেকেই

আমার ঘরের-

দরোজা জানালার কপাট খোলাই ছিল।
একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে
বাইরের দৃশ্যে তাকাচ্ছিলুম,
জানালা পথে হু হু করে ঢুকছে হাওয়া
নাকে চোখে মুখে
লাগছে ঝড়ের ছোঁয়া।

বেলা বাড়তে থাকে-

বাড়তে থাকে আমার বয়স;
ভাবছিলুমঃ

দরোজা জানালা বন্ধ রাখাই ভাল।

এমন সময়-

বাইরে থেকে কে যেন বললেঃ
জন্মান্বা কি জানে বৃষ্টির পাতারা সবুজ?
আর-সমুদ্রের রং আকাশের মত নীল?
ভেতর থেকে আবার ঐ কণ্ঠস্বরঃ
-দরোজা জানালা সব বন্ধ করে দাও।

বেলা যখন বাড়ল-টের পেলুম

মনের দরোজা জানালা বন্ধ রাখাটাই ভাল।

কঠোর পণ

প্রভাসানন্দ (বিধুর) দেওয়ান

থাকবো না আর বন্ধনে
থাকবো না আর অজ্ঞানে।
থাকবো না আর এমন ঘরে
অন্ধ যেথা ঘোর আঁধারে।

মারের বাঁধন তুচ্ছ করি
মুক্তি পথে যাত্রা করি,
দেখবো জগৎ ঘূণা ভরে
লোভ মোহ দ্বেষ্টা ছিন্ন করে।

চলব এবার মার্গ পানে
ত্যাগই সার সত্য জেনে।

এই করিনু কঠোর পণ
সঁপে দেবো জীবন মন।